# শাহেরবানু

গল্পগুলি ইতিপূর্বে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও বর্তমানে অনেক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে প্রকাশ করা হোলো। অধিকাংশেরি রচনা কাল তেরোশো পঞ্চাশ-একান্ন সাল এবং রচনাগুলি প্রাথমিক।

গল্পগ্রন্থটির প্রকাশ ব্যাপারে বন্ধু নির্মলেন্দু গুপ্ত, মোজাম্মেল হক প্রভৃতি নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে জানানো প্রয়োজন: আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।

কামদেবপুর, আবুল কালাম শামসুদ্দীন

শরতকাল, ১৩৫৩ সাল।



# শাহেরবানু

আবুল কালাম
শামসুদ্দীন

অগ্রণী বুক ক্লাব
১৬ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা

প্রকাশক :
দেবকুমার গুপ্ত
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৬ বৃন্দাবন বসু লেন,
কলিকাতা
মুদ্রাকর :
শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা
প্রচ্ছটপট :
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক নির্মাণ ও প্রচ্ছটপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা

দুই টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ :
অগাস্ট ১৯৪৬,
শ্রাবণ ১৩৫৩

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ও

অনুরাগী বন্ধুদের করকমলে

# শাহেরবানু

তাহাকে লইয়া সে এক মধুর স্বপ্ননীড় রচিবার সংকল্প করিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষণ শাহেরবানুময় হইয়া আছে। ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে তাহারই কথা ভাবিয়া সে ভুলিয়া গিয়াছে পিঠ-পোড়া রৌদ্রের জ্বালা, ভুলিয়া গিয়াছে দুঃখবেদনাময় পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা—বিষাদমলিন মুহূর্তগুলিও তাহারই কেন্দ্রায়িত ভাবনায় কী এক ভাষা পাইয়া পরম মাধুরিম হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিয়া অবাক হয় মাজেদ, কেমন করিয়া ঐ সপ্তদশী বালিকা তাহার হৃদয়ের সকল অনুভূতি এমন করিয়া জুড়িয়া বসিল।

মুখ খুলিয়া কাহাকেও সে একথা জানায় নাই। বন্ধু বান্ধবদের মুখে এই ধরনের অনুযোগের কাহিনী শুনিয়া মাজেদ হাসিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে কতো! একটি ছেলে যে কোনো মেয়ের জন্য এমন পাগল হইয়া উঠিতে পারে তাহা কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাহার ধারণার অতীত ছিল, আজো, কী করিয়া যে এমন আকর্ষণ জন্মিল যাহার জন্য শাহেরবানুর ক্ষণিকের দেখার জন্যও সে উন্মুখ হইয়া তাহাদের বাড়ির কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে, ভাবিয়া মাজেদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।

কখনো কখনো জোর করিয়া তাহার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, ভাবিয়াছে মাথার উপরে যে দুঃখরাত্রির অন্ধকার ছাইয়া আসিতেছে আর কোনোদিক খেয়াল না করিয়া এবার তাহা অপসারণের চেষ্টাই তাহাকে করিতে হইবে। সাংসারিক দুঃখকষ্ট, নানা বাধা-নিষেধ প্রভৃতির কথা ভাবিয়া কখনো সে মনে মনে কঠিন হইবার সংকল্প করিয়াছে, কিন্তু তবু শাহেরবানুকে ভোলা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বরং সে

যেন তাহার স্থকুমার সৌন্দর্য লইয়া তাহার কাছে আরো পরম কাম্য হইয়া উঠিয়াছে। আরো উগ্রতর হইয়াছে তাহাকে পাওয়ার ব্যাকুলতা।

সেদিন অতো ভোরে দুই হাঁড়ি মাছ বাঁকে ঝুলাইয়া শহরের পথে পা দিয়াছিল তাহারই জন্য।

গাঙতীরে ধানক্ষেতের গা ঘেঁষিয়া পথ। দুইধারে ঘাস আর ঝোপ-ঝাড়। ঘাসের ডগায় ডগায় গতরাত্রির শিশিরবিন্দু নীল রৌদ্রে চিকমিক করিয়া ঝলকাইতেছে। পথ কিছুদুর এইভাবে চলিয়া ক্রমান্বয়ে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইপাশে পোঁতা ঝাউয়ের সারি লইয়া শহরে ঢুকিয়াছে। 'চাঁই'তে ধরা কিছু কই খলিসা লইয়া, সকালবেলার এই বিজনপথে চলিতে চলিতে সে যে কী না ভাবিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শহরের মাইল তিনেকের মধ্যে নদী হইতে খাল আসিয়া যেখানে পথটাকে দুই ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে সেখানে পেঁাছিয়া মাজেদ খেয়াল করিল—বেলা ইতিমধ্যে বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার আরো একটু দ্রুত চলা প্রয়োজন! নইলে যাইতে যাইতে রৌদ্রে মাছ মরিয়া গেলে কেহ আর তাহা ছুঁইতেও চাহিবে না। সকল আশা নষ্ট হইবে। এক এক কুড়ি ছ' আনা করিয়া বেচিলেও পাঁচকুড়ি কই মাছের দাম হইবে—মাজেদ হিসাব করিয়া দেখিল—এক টাকা চৌদ্দ আনা, আরো যেসব খুচরা মাছ আছে তাহার দামও অন্যূন আনা আটেক হইবে। মোট হইল দুই টাকা ছয় আনা। শাহেরবান্থ তাহার সইয়ের যে শাড়িখানার কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহার দাম নাকি সওয়া পাঁচ টাকা, স্থতরাং বাকি টাকাটা সে কর্জ করিবে। পথের পাশেই আছে হাশেম মোল্লার মুদিখানা। মোল্লা তাহার মায়ের দিক দিয়া কি রকম দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। দোকানপসার করিয়া অবস্থাটা বেশ স্বচ্ছল করিয়া লইয়াছে। তাহার

কাছে গোটাতিনেক টাকা ধার চাহিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। শহরের বাজারে মাছের যেরকম দাম বাড়িতেছে, শোধ করিয়া দিতে তাহার সময় লাগিবে না।

তাহার মা বলিয়াছিল এই মাছ বেচা টাকায় ধীরে ধীরে কাছারির বকেয়া খাজনাটা শোধ করিয়া দিতে। অনেক টাকা বাকি পড়িয়াছে, এখন হইতেই ধীরে ধীরে শোধ করিয়া না দিতে থাকিলে, কোনদিন কী বিপদ হইয়া যাইবে, তখন আর উদ্ধারের উপায়ও পাওয়া যাইবে না। সামনাসামনি মাজেদ তাহার কথায় সম্মতি দিয়া আসিয়াছে। দিতে বাধ্য হইয়াছে। এতো কষ্ট করিয়া জলে কাদায় যে এই মাছ ধরিয়াছে অন্য কাজের জন্য—শাহেরবানুর জন্য—সে কথা তাহাকে বলে কেমন করিয়া! অবশ্য এ টাকাটা যে কাছারিতে দেওয়া হইল না নায়েব প্রমুখাৎ সেকথা শীগ্‌গীরই সে জানিতে পারিবে। তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।

আর মাও যে কিছু টের পায় নাই কে বলিবে। চালচলনে মাজেদ যে আজকাল অনেক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে সে লক্ষ্য করিয়াছে মা তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণচোখে চাহিয়া আছে। টের পাইলেও ভালো; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলার দায় হইতে সে বাঁচিয়া যাইবে।

কিন্তু তাহার কথাবার্তায় যে আবার অন্যরকম মনে হয়। কথনো কথনো বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া মা কাছে আসিয়া বসে—অমুকের মেয়েটি বড় ভালো, তমুকের—; তাহাদের বাড়িতে নাকি আজকাল আসা যাওয়াও বাড়িয়া গেছে তাহার। মাজেদের যখনই সম্মতি লইতে আসিয়াছে, সে সাফ না বলিয়া দিয়াছে। মা অবাক হইয়া তাহার মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাঝে

মাঝে মাজেদের মনে হয়, হয়তো কথাটা চাপিয়া রাখিয়া সে ভুলই করিতেছে, মাকে জানাইয়া দেওয়াই ভালো।

অথচ আজিকার এই শাড়ি কেনার ব্যাপারটা মায়ের কানে উঠিলে তাহার সংকোচের সীমা থাকিবে না। কিন্তু না, লজ্জাই বা কিসের!

সে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করে মাজেদ মুখনিচু করিয়া একদিন সব বলিয়া ফেলিবে। মা নিশ্চয়ই রাগ করিতে পারিবে না। সংসারের অন্যান্য অভাব অনটন, সে জোয়ান মর্দ থাকিয়াও দূর করিতে পারিবে না!

আপাতত যে সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে তাহা রক্ষাই মাজেদের আশু কর্তব্য। এই উপহার দিয়া শাহেরবানু এবং তার মায়ের একটু সন্তুষ্টি আসুক—ইঙ্গিতে শাহেরবানুর মাকে অন্তত তাহার দাবিটা তো জানাইয়া রাখুক। অবশ্য ইচ্ছা করিলে হয়তো এখনই বিবাহটা ঘটাইয়া ফেলা যায়, কিন্তু নানা অসুবিধায় সে ব্যবস্থা এখন কিছুতেই সম্ভব নহে। বিবাহে এটা ওটা—নানাপ্রকারে টাকা পয়সা প্রয়োজন, সে সব পাইবে কোথায়? কেবল কলেমা পড়াইয়া বউ ঘরে আনা নয়, দস্তুর মতো একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া, কাসেম খাঁর নাকের উপর দিয়া শাহেরবানুকে ঘরে আনিতে হইবে।

ভবিষ্যৎ কল্পনায় উৎসাহিত হইয়া মাজেদ বাঁকটা কাঁধ বদল করিয়া লইল।

অথচ দেরীতে আবার দুর্ভাবনাও আছে। কাসেম খাঁ ওদিকে বড়ো বেশি ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি যে কোনখানে, সেকথা শাহেরবানুর মা সবুরজান এতো ধুরন্ধর হইয়াও যে কেন বোঝে না ভাবিয়া মাজেদ বিস্ময় অনুভব করে। শাহেরবানুকে বিবাহ করিবার লোভ তাহারও আছে কিন্তু তার চাইতেও বেশি

লোভ অভিভাবকহীনা সবুরজানের সম্পত্তির উপর। জায়গাজমি মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে কাসেমও তাহার বাপের মতোই চালাকচতুর, সবুরজানের সঙ্গে তাহার মাখামাখি বাড়িবার কারণও কতোকটা সেইখানে। অথচ ঐ কাসেমই যে সুযোগ পাইলে সবুরজানের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিবে না, সেকথা কে বলিবে। বুড়ী ওর ছদ্ম আত্মীয়তায় ভুলিয়া বসিলেই তো সর্বনাশ। সম্পত্তির পরোয়া সে করে না কিন্তু শাহেরবানুকে সে পাইবে না, সে হইবে ঐ কাসেমের অঙ্কশায়ী, একথা ভাবিতেও তাহার মন উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। মুখ বিকৃত করিয়া সে আপন মনেই বলে, আরে বাপু, তুমি ঘোরাঘুরি যতোই করো, আসল কথাতো শাহেরবানুর পছন্দ লইয়া। কয়েক 'কুড়া' জমি না হয় কাসেম খাঁর আছে, কিন্তু রূপ? ঐ তো কালিবকের মত চেহারা। উহাকে পছন্দ করিবে কি দেখিয়া, সম্পত্তি দিয়াই যদি গুণাগুণ বিচার করে তবে পাশের গ্রামের বৃদ্ধ করমালীর প্রস্তাব সবুরজান প্রত্যাখ্যান করিল কেন? আর শাহেরবানুও যে কাসেম খাঁকে দেখিলে কিরকম টিটকারীতে মুখর হইয়া ওঠে—তাহাও মাজেদ জানে। মাজেদ তাহার যাকিছু আনন্দ আর ভরসা তো পায় সেইখানেই।

নিশ্চয়ই, মাজেদ রূপের তুলনায় তাহার সঙ্গে অতুলনীয়। এ তাহার নিজের অহংকার নয়, ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে তাহার নাকি রাজ পুত্তুরের মত চেহারা। বড়োমিয়ার ছেলে একদিন বলিয়াছিল, শহরে জামা জুতো পরে বেরোলে কে বলবে তুমি কোনো বড়ো ঘরের ছেলে নও। অবশ্য গর্ব করিবার মতো রূপ হয়তো এখন আর নাই। বাপ মরিবার পরে অনবরত কাদা রৌদ্র জলে খাটিয়া, অসুখেবিসুখে ভুগিয়া, গায়ের সেই উজ্জ্বল লাবণ্য তামাটে চামড়ার আড়ালে ঢাকিয়া গিয়াছে, দেহের সেই মাংসল বিশালতাও যেন শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

আর্থিক অবস্থা কাসেমের তুলনায় তাহার একটু খারাপই। এবার এই আকালের বৎসরে সকলের ঘরেই অল্পবিস্তর টানাটানি চলিতেছে। এই রাজায় রাজায় যুদ্ধে উহার বিনাশ হইয়া থামুক, তারপর দেখা যাইবে, কাসেম খাঁর চাইতে সুন্দর ঘর সংসার জায়গা জমি সে গুছাইতে পারে কিনা! জীবনের এখনো কত বাকি—তাহার দুঃখের সংসারকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবে না সে!

শাহেরবানুকে লইয়া একটি ছোট্ট স্বচ্ছল সংসার গড়িয়া তুলিবে; শত প্রতিকূলতা সত্বেও সে নিজের বাহু ও বুদ্ধির শ্রমে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আনিবে, শাহেরবানু কর্ত্রীত্ব করিবে—কতো রঙীন কল্পনা তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। বউ শাহেরবানুর ঘোমটা টানা সরমাতুর মুখ, তাহার লঘুপায়ের আসাযাওয়া, চুরির রিনিঝিনি, সমীহ, ব্রীড়া—ভাবিতে ভাবিতে মাজেদের মন এক মধুর পুলকের আস্বাদে উদ্দীপিত হইয়া ওঠে। একটা গাছের নিচে দাঁড়াইয়া বাঁকটা নামাইয়া বিশ্রাম করিয়া লয়।

কিন্তু ভাগ্য যেন তাহার সব আশার মূলে কুঠার হানিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। কাল সকালে খালে মাছ ধরিতে গিয়াছিল; সেখানে সিকু মাঝির সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় চোখ ঠারিয়া সিকু প্রশ্ন করিল, ওদিকের কী করলে? কাসেম খাঁ সবুরজানকে যে প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলল।

সিকু এককালে পাঠশালায় প্রথমপাঠের সময় তাহার সহপাঠিত্ব না করিলেও সহবেঞ্চিত্ব করিয়াছিল, খুব তুখোড় ছেলে। হয়তো উহাদের বাড়িতে মাজেদের আসাযাওয়া দেখিয়া সে কিছু অনুমান করিয়া লইয়াছে। মাজেদ তাহার প্রশ্নে একটু সংকুচিত হইয়া পড়িলেও তাহার শঙ্কার চাহনি সিকুর চোখ এড়ায় নাই।

মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, তোমার পছন্দের তারিফ করি। কিন্তু শোনো, সবুরজান কী চায় বোঝো তো? কাপড়চোপড়, টাকাপয়সা এটাওটা দিয়াটিয়া ওকে হাতে রাখো, নইলে কিন্তু ফসকাবে। এই সিকু একটা কথা বলল, রাখো, নইলে দেখো শেষে পস্তাতে হবে। পরে স্বর নামাইয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, কাল কাসেম আমাকে কী বললে জানো? বললে বুড়িকে ভুলিয়েভালিয়ে হাত করার চেষ্টায় আছি। ওকে একবার ভিজাতে পারলে—আর বিয়ের কথা তুললে না বলতে পারবে না।

সিকু আর কি বলিয়াছিল মাজেদ শোনে নাই। মনটা হঠাৎ হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, সিকু চলিয়া যাইবার পর জালাটাকে ফেলিয়া বিমর্ষ মনে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। আর মাছ ধরায় মন বসিল না।

বাড়ি ফিরিয়া সারাটা দুপুর অন্যমনস্কভাবে এটাওটা করিয়া, মায়ের কাছে কয়েকবার বলি বলি করিয়া ইতস্তত করিবার পর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক, এবাড়ি ওবাড়ি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, সামান্য কারণে অনর্থক ছোট বোনের গালে একটা চড় কশাইয়া, ডিঙি লইয়া উহাদের বাড়ির দিকে রওনা হইয়া গেল। মাকে বলিয়া গেল, তালতলার হাট থেকে একবার ঘুরে আসি।

কুচুরীপানা ভরা মরা খাল বাহিয়া শাহেরবানুদের ওখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে বেলা পড়িয়া গেল। সবুরজান তাহাকে আদর আপ্যায়ন মন্দ করিল না। কৌশল করিয়া কথা বাহির করিয়া মাজেদ জানিল—সবুরজান হাসিয়াই বলিল, পাগল! কাসেমের সঙ্গে বিয়ের কোনো কথাই ওঠে নাই—তবে অন্য কোথাও যদি ভালো সম্বন্ধ না জোটে তবে—

গোল্লায় যাউক সে তবে। মাজেদের সমস্ত মন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এদিকওদিক চাহিয়া কয়েকবার শাহেরবানুর খোঁজ

করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। শাহেরবানুকে অন্তত একবার দেখার গোপন ইচ্ছা থাকিলেও, অনর্থক দেরী করায় সবুরজান আবার কিছু ভাবিয়া বসে সেই সংকোচে, আর তাহা ছাড়া, সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে বলিয়া, মাজেদ বিদায় লইয়া আসিল। যাউক, সেও এবার কাসেমের পথ ধরিবে। আর মাকে দিয়া একবার—

ভাগ্য ভালো। উহাদের বাগানে অপ্রত্যাশিতভাবে শাহেরবানুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সন্ধ্যা তখন আসন্ন ; হাজীবাড়ির মসজিদ হইতে আজানের শব্দের ডাক উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাজেদ শাহেরবানুকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। শিউলিফুলের বোঁটায় রঙকরা একখানা হলুদরঙের কাপড়ে তাহার কিশোরী গৌরতনু মাজেদের চোখে যেন এক অপরূপ সৌন্দর্যের মতো দেখাইল।

সে খুব সম্ভব আঁকসী দিয়া 'কাফিলা'গাছের উপর হইতে বরবটি পাড়িতেছিল ; মাজেদের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই দুইজনে একটু লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইল। প্রথমটা, মাজেদ কোনো কথা না বলিয়াই চলিয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু খানিকদূর গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল, কি বলিবে ভাবিয়া, ইতস্তত করিয়া, সে প্রায় ঘামিয়া উঠিল।

—কথা না বলেই যে বড়ো চলে যাচ্ছিলেন ?—শাহেরবানুই তাহাকে বাঁচাইল।

—বাড়িতে কাজ আছে কিনা তাই—মাজেদ হাসিল—ভালো আছো তুমি !

—হ্যাঁ, কী এমন কাজ। কখন এলেন জানতেও তো পারলুম না।

মাজেদ একটু খুশি হইয়া গেল—এসেছি অনেকক্ষণ, তোমাকে—বলিতে যাইয়াই মাজেদ আবার চুপ করিয়া গেল, তোমাকে খুঁজিয়াছি, একথাটি যেন মুখে আটকাইয়া গেল।

—কী তোমাকে ?

—কিছু নয়; এই আজকাল তো পর্দানশীন হয়ে গেছো, এলেই বা কেমন করে জানবে!

মাজেদ হাসিল, কিন্তু ইহার পর আর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আজ তাহলে আসি।—বলিয়া দু'পা বাড়াইয়াই সে আবার ফিরিয়া আসিল। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতাম, রাগ করবে না তো ?

—কী ? হাসিমুখে শাহেরবানু প্রশ্ন করিল।

—তোমার মায়ের হয়তো ইচ্ছা কাসেম খাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। তোমারো সেই ইচ্ছে নেই তো ?

শাহেরবানুর আঁকসী গাছেই ঝুলিয়া রহিল, সে লজ্জায় মুখ নামাইল।

—আমি জানি, তোমার মত নেই। কিন্তু সেরকম কোনো চেষ্টা হলেও তুমি বাধা দেবে, অমত করবে, বলো, অমত করবে!—মাজেদের কণ্ঠে অনুনয়ের স্বর ফুটিয়া উঠিল। শাহেরবানু আর মুখ তুলিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। খুশির উল্লাসে মাজেদের বুক ভরিয়া গেল। ইহার পরই সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, তোমাকে যদি আমি একখানা শাড়ি কিনে উপহার দিই, নেবে ?

শাহেরবানু মুহূর্তের জন্য চক্ষু তুলিয়া তাকাইল। মাজেদ তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার প্রশ্ন করিল, কেন নেবে ভাবছো ? ধরো, আমি তোমাকে এই এই, এমনিই দিচ্ছি। আচ্ছা সে কথা না

মাজেদ কৌতুকে তাহার দিকে তাকাইল—তুমিই দোকানদার! বেশ, বেশ!

মেয়েটির ছোট্ট মুখে একটু সলজ্জ হাসি খেলিয়া গেল।

মাজেদ বসিয়া গামছায় খানিকক্ষণ গায়ের ঘাম মুছিল, পরে চোখ তুলিয়া দেখিল মেয়েটি তখনো তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে, হাসিয়া কহিল এট্টু পানি খাওয়াও তো মণি। মোল্লা কোথায়?

মেয়েটি হাতবাক্সের কাছ হইতে উঠিয়া আসিল, সলজ্জস্বরে বলিল, পান্তা খেতে গেছে। আপনি বসুন, আমি পানি নিয়ে আসছি।

মাজেদ হাঁড়িদুইটার ঢাকনি খুলিয়া মাছগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া গামছা নাড়িয়া হাওয়া খাইতে খাইতে হাশেমের দোকানের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। যুদ্ধের বাজারে ফাঁপিয়া হাশেম দোকান খানাকে আরো বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে। দুই বৎসর আগে দোকান কী ছিল, আর আজই বা কেমন হইয়াছে!

অকস্মাৎ মাজেদের সঞ্চরমান হাতখানা থামিয়া গেল। চোখের দৃষ্টি একাগ্রলক্ষ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

টাকার ভাবনা সে করিতেছে, ঐ হাতবাক্সের মধ্যেই হয়তো তাহার অন্ত নাই। কাছাকাছি কেহ কোথাও নাই, মেয়েটিও তাহাকে চেনে না, এই সুযোগে ওটা লইয়া সরিয়া পড়িলে কেমন হয়?

টাকা! শাহেরবানুকে একান্ত আপন করিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না, তাহাকে হারাইবার দুশ্চিন্তা থাকিবে না, দারিদ্র্য ঘুচিবে, ধার কর্জ শোধ করিয়া বন্ধক জমি ছাড়াইতে পারিবে, কাছারির পেয়াদা নালিশের ভয় দেখাইবে না—সম্পদ আসিবে, চাই কি হাশেমের মতো এই একটা দোকান—জাজ্বল্যমান ভবিষ্যৎ যেন তাহার চোখ ঝলসাইয়া দিল আর তাহারই আকর্ষণে মাজেদ এদিকওদিক চাহিয়া দ্রুতপদে

হাতবাক্সের কাছে আগাইয়া গেল। অজস্র আছে হাশেমের, এই সামান্য অপহরণে কতোটুকু ক্ষতি হইবে তাহার।

পানি লইয়া মেয়েটি ফিরিয়া আসিল।

—বাঃ হাতবাক্স ধরছো কেন? ওকী, কোথায় যাচ্ছো?

মাজেদের মতলব বুঝিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, বাজান শিগ্‌গীর এসো, হাতবাক্স চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম চুরির উদ্বেগ এবং উহার চিৎকারে মাজেদ দিশেহারা হইয়া পড়িল। এইভাবে আজ এখানে ধরা পড়িলে কি অবস্থা হইবে, ভাবিয়া মুহূর্তের মধ্যে তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল, মনে হইল চতুর্দিক হইতে যেন অপমান ও লাঞ্ছনার অন্ধকার তাহাকে ঘিরিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। যেন উপায়হীন হইয়া সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্লার একটা ভারি ওজন লইয়া, তাহাকে নিবৃত্ত করিবার অক্ষম চেষ্টা করিয়া, অবশেষে এক প্রচণ্ড আঘাতে তাহার মাথায় বসাইয়া দিল।

মেয়েটি আর চিৎকার করিল না এবং আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে পড়িয়া গেল। ঘড় ঘড় শব্দে গলার কাছে কী এক ব্যাকুল আকুলতা নিঃশেষ হইয়া রক্তের স্রোত নামিয়া আসিল। ফিনকি দিয়া উষ্ণ রক্ত ছুটিয়া মাজেদের দেহ ভিজাইয়া দিল।

মাজেদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গেল; বাঁ হাতের বগল হইতে হাতবাক্সটা সশব্দে নিচে পড়িয়া গেল। ও কে আসছে ছুটে, হাশেম মোল্লা, ভয়ে ও আতঙ্কে মাজেদ হিম হইয়া গেল।

সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া মাজেদ দিকবিদিকহারা দৌড়ে পিছনের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া জ্ঞানশূন্যের মতো পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হাশেম এবং আরো দুই একজন ছুটিয়া দোকানে আসিয়াছে, তাহার ব্যাকুল প্রশ্নের কোনো জবাব কেহ দিতে পারিল না। মেঝেতে

মেয়ের নিস্পন্দ দেহ রক্তে ভাসিতেছে—তাহার পায়ের কাছে হাতবাক্স। ব্যাপারটা বুঝিয়া হাশেম ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফাইয়া উঠিল। কোথায় গেলো সে শালা—বাঘের মতোই গর্জন করিয়া চালে গোঁজা মোটা লোহার ফলকওয়ালা কোঁচটা টানিয়া সে দোকানের বাহির হইয়া গেল।

—ঐ, ঐ পুকুরে ডুব দিয়ে আছে।

সোরগোল উঠিল। হাশেম পুকুর পাড়ে ছুটিয়া আসিল, তাহার অশ্লীল উন্মত্ত গালাগাল, বিলাপ এবং লাফালাফিতে সমস্ত পাড়া ভয়ংকর রূপে মুখর হইয়া উঠিল। তাহার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। ওকে আজ মাছের মতো আমি গাথবো।

পর পর দুইটা খুন হইতে চলিয়াছে দেখিয়াও কেহই তাহার সেই উন্মত্ত হিংস্র মূর্তির কাছে আগাইয়া যাইতে সাহস করিল না।

জলের মাছের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'কোঁচ' হাতে শিকারীরা যেমন সুযোগের প্রতীক্ষা করে, হাশেমও হিংস্রচোখে পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া সেই-মতো সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কলমিলতার আস্তরণ ঠেলিয়া শালা কি শ্বাস লইবার জন্যও মাথা তুলিবে না!

হয়তো তাহারই জন্য একটা স্থানের কলমিলতা একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হাশেমের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার নয়। পর মুহূর্তেই কাহার ছটফটানিতে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল; ঝলকে ঝলকে রঙীন রক্ত চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল, তাহারি এক ঝলক ছুটিয়া আসিল হাশেমের মুখে। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে সেই রক্তরঙীন মুখে, প্রচণ্ড উল্লাসে কোঁচ ঠাসিয়া ধরিয়া, পাড়ে দাঁড়ানো জনতার দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া বুকফাটা হাসি হাসিয়া উঠিল।

মস্তকে কোঁচবিদ্ধ দেহটা অবশেষে সে টানিয়া তুলিল। মাজেদের কণ্ঠে স্বর ছিল না। প্রাণের কোনো কাকুতি ছিল না, হাত পা আর

দুইটি ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিয়া ছড়াইয়া একসময় নিথর হইয়া আসিল। যে চক্ষু শাহেরবানুর স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহার একটা কোট-রাগত এবং অন্যটা একটা কোঁচের ফলার মাথায় বসিয়া যেন মাজেদেরই নিস্পন্দ দেহটার দিকে জিজ্ঞাসার মতো তাকাইয়া আছে।

এবং তাহারই গা বহিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত চুঁয়াইয়া পড়িতেছিল কাঁদিতেছিল কি ?

# ইতিকথা

আজকালকার এমন দিনে নীতিধর্মের শিকল পরে ভালোমানুষী করা যে আত্মহত্যারই সামিল, সুতরাং বোকামি, একথা জরিনা হোসেনকে হাজারবার বোঝাতে চাইলেও সে স্বীকার করেনি, তাছাড়া করিম খাঁর সঙ্গে তার তুলনা দেওয়াতেও সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল।

করিম এগ্রামের সর্বজনচেনা নিশাচর চোর। রোজরাত্রে গ্রামের বুকচিরে প্রবহমান খালে তার ছোটো ডিঙিখানা সন্তর্পনে নিশীথের অভিসারে বেরোয়। কোথায় যায় কী করে অন্ধকারে জানা না গেলেও, ভোরের বেলা আশেপাশের গ্রামের বাগানের মালিকেরা দেখে তাদের বাগানের নারকেল, সুপুরি সাফ হয়ে গেছে; আর কচিৎ কেউ কখনো দেখে ফেলে যে, বন্দরের দিক থেকে করিম নিশ্চিন্তমনে নৌকো নিয়ে বাড়ি ফিরছে—নৌকোর মধ্যে হোগলাপাতায় ঢাকা হরেকরকম সওদা। চালের দর পৌঁছেচে চল্লিশে, গ্রামের অনেক পরিবার গাঁয়ের মাটির আকর্ষণ ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে এদিক-ওদিক চলে গেছে, কেউ কেউ অনন্যোপায় হয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে, এমন নিষ্করুণ অবস্থার মধ্যেও মাত্র কয়েক 'কুড়া' জমির মালিক করিম স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে আছে দেখে জরিনা মুগ্ধবিস্ময়ে তার প্রশংসা করে। মনেমনে ভাবে যে, হ্যাঁ এইকরম লোকই আজকালকার স্বার্থপর জগতে বাঁচবার উপযুক্ত। সেদিন ভোরে রোজকার মতো পাশের খাল দিয়ে করিমের নৌকো ছিপ ছিপ শব্দতুলে চলে যাবার পর সে শুয়ে শুয়ে হোসেনকে এই কথাটাই বলেছিল। হোসেন অত্যন্ত ভালোমানুষ, (অবশ্যি জরিনা মনে মনে তাকে বোকা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না)

তার মতো সরল নিরীহ মানুষ যে সারা বাহাদুরপুর গ্রামে আর দ্বিতীয়টি নেই, সে সম্বন্ধে য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থেকে শুরু করে পাগল জয়নুল্লা পর্যন্ত সকলেই একমত। সাংসারিক অবস্থা তার খুবই খারাপ কিন্তু তবুও খোদার দয়ার ওপর অসীম বিশ্বাস রেখে খেয়ে না খেয়েও সে ঘোর দুর্দিনে বিপাকের মধ্যেও প্রাণধারণ করে আসছিল। যেকাজে প্ররোচনা দিতে চাইছে জরিনা, তাতে ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণও ছিল তার। না হয় একবেলা ক্ষুদের জাউ খেয়েই আজকাল তাদের দিন গুজরান হচ্ছে, হতে পারে ভবিষ্যতের দিনগুলো আসছে অনাহারের বিভীষিকা নিয়ে, কিন্তু তাই বলে কি সে বাপদাদার মুখে কালি লেপে চুরি করতে নামবে ছিঁচকে চোর করিমের মতো! খানিক চুপ করে থেকে গর্বিত গলায় বলেছিল—বউ, খোদা বলে কেউ নেই ভাবো,—পাপপুণ্যের হিসাব কী একদিন হবে না?

জরিনা যেন সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তিতর্ক ভ্রূ নাচিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, দুনিয়াতে বাঁচার কথা আগে, তার পর তোমার পাপপুণ্যের কথা বোলো। মুখপোড়া খোদা থাক বা না থাক (হোসেন চমকে উঠল)—দেখছ না, না খেয়ে মরে থাকলেও তার এতোটুকু আসবে-যাবে না। তোমার অমন ধর্মপ্রাণা মা চিকিৎসার অভাবে কী যাতনা পেয়ে মরে গেলেন! গাঁয়ের কতোলোক কতো দুঃখকষ্টে ব্যারামে উজাড় হয়ে যাচ্ছে তবু খোদাতালা কতোটুকু দয়াবৃষ্টি করলেন?

হোসেন থতোমতো খেয়ে হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে কিছুসময়। তারপর উঠে তামাক সেজে গোটা দুই টান দিয়ে জোর গলায় বলেছিল, কী যে বলিস, গরীবের ভরসাই খোদাতালা।

—থাকো ভরসায়, তার এইতো ফল হাতেনাতে পাচ্ছি। ঘরে চাল নেই, পরনে কাপড় নেই, জমিজমা যাচ্ছে শত্তুরের পেটে, দুর্ভাগ্যের

২

অসংখ্য নজীর দেখিয়েছে জরিনা। কোন দোষে তোমার এমন অবস্থা হোলো বলো—উঠতে বসতে অষ্টপ্রহর দেখি খোদার নাম নাও ?

হোসেন একথার কোনো জবাব দিতে পারেনি। সত্যি তার মাও গত ভাদ্রে বড়ো কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছেন। গ্রামে কারো কাছে একটা টাকাও ধার মেলেনি, চাইতেও সাহস করেনি, ঋণের বোঝা অনেক বাড়িয়েছিল বলে, মানুষের দয়া তো মিললোই না, না খোদার করুণা। এক শ দিন ভুগে আল্লার নাম স্মরণ করতে করতে তিনি চোখ বুজলেন কিন্তু তবু আল্লা তাকে এতোটুকুও দয়া কেন করলেন না কে তা বলবে হতে পারে হয়তো তারই কোনো দোষের জন্য। মায়ের জোয়ান ছেলে সে, তারই তো উচিত ছিল তাকে সবরকমে সুখেযত্নে রাখা। কিন্তু সেরকম ক্ষমতা কই তার ? খোদাতালা যেরকম তার কপাল গড়েছেন—হোসেন অকস্মাৎ সে চিন্তা ছেড়ে দিয়েছিল, হুকোয় কয়েকটা টান দিয়ে জরিনার দিকে তাকিয়ে আবার বলে উঠেছিল, পাপের কড়িতে কোনোদিন আসান নেই। দেখছো না মদন মাঝিগো অবস্থা ! ডাকাতি করে করে জমিদার হোলো, দীঘি কাটাল, উঠল পাকাবাড়ি, কিন্তু এখন সে বাড়িতে বাতি দেবার আছে কেউ ? পাপের ধনে কখনো আসান নেই। খোদার গজব একদিন না একদিন পড়বেই।

এতো জ্বলন্ত উদাহরণ দেওয়ায় জরিনা সহসা উত্তর দিতে পারেনি। মদনমাঝিদের পোড়ো বাড়িটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল—তার বংশধরেরা এখন নাকি শহরের পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়—তা হোসেন স্বচক্ষে দেখে এসেছে। এ গ্রামের সেরা সুন্দরী ছিল মদন-মাঝির এক নাতনী, কতো কাহিনী জড়িয়ে আছে তার নামের সঙ্গে, সেও নাকি পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি শুরু করেছে কাছের এক বন্দরে। কিন্তু এ দুরবস্থা যে মদনমাঝির পাপের ফল, একথা মেনে নিতে তার মন সায়

দেয় না। খানিকপরে একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে সে বলে উঠল করিম খাঁ তো বেশ আছে! আমাদের ভালোমানুষীতে মরণ ছাড়া গতি নেই।

হোসেন হুঁকোটা রেখে আবার শুয়েছে তখন। ভোরে একটু জোলো হাওয়া দিয়েছে—সেদিন বেশ শীত শীত লাগছিল। জরিনার কথায় সে বিরক্তিভরে তার দিকে তাকাল। ওকথার অন্তরালে যেন করিম খাঁর স্তুতি। আপন স্ত্রীর মুখে পরপুরুষের প্রশংসা, কোথায় যেন তার স্বামিত্বকে খাটো করে তোলে। জরিনার সমস্ত কথা, কল্পনা কাজ, ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র তাকে ঘিরেই থাকুক, এই-ই তার কাম্য। এ তার এক দুর্বলতা। স্বামীর প্রতি একান্তভাবে মনোযোগকেই সে সাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করে। কিছুক্ষণ সে ক্ষুণ্নমনে চুপ করে রইল; তারপর যেন জরিনাকে আঘাত দেবার ছলেই বললে, বউ, ছেলেমেয়ে কোলে থাকলে বুঝতে, নইলে যে পাপ করলে বংশের বাতি নেভে, আমাকে কখনো সে কাজ করতে বলতে না।

জরিনার মুখে আর কথা জোগাল না, আড়ষ্ট হয়ে সে শুয়ে রইল। বিরক্তও হোলো খানিকটা। সে বন্ধ্যা। এজন্য নিজেও সে কম দুঃখিত নয়, তবু হোসেন একথাটা নিয়ে যখনতখন এভাবে খোঁটা দেয়—দুঃখ দেবার জন্যই কী?

কিছু সময় দুজনেই চুপ করে থাকার পরে জরিনা গজ গজ করতে করতে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল—করো শুয়ে শুয়ে পাপপুণ্যের হিসাব, ফসলের এখনো দুমাস দেরি। এতোদিন যদি কালকের সুপুরি বেচা ছটাকা সাত আনায় চলে তবে আর ল্যাঠা কী!

হোসেন তার রাগ দেখে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, উঃ কী সাংঘাতিক মানুষ তুমি বউ,—আমাকে চুরি করতে বলছো? যদি জেলে যাই?

—তবু খেয়ে বাঁচবে। আস্তে কথাটি বলে জরিনা উঠোনে নেমে গেল। হোসেন রাগে দুঃখে কাঁদবে না চিৎকার করবে ভেবে পেল না। অবাক হয়ে রইল।

তখন আশ্বিনের শেষ। ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের গোছা সবে সবুজ হয়ে উঠেছে। হোসেনের অবশিষ্ট ক্ষেতখানার ধানের শিষে সবুজ কুঁড়ি চোখ মেলেছে। প্রতিদিন অধীরচিত্তে হোসেন তাদের বেড়ে ওঠা লক্ষ্য করে। কিন্তু ফসল আগের মতো জোরাল হয়ে উঠেনি এবার, তাছাড়া আরো আশঙ্কার কথা ক্ষেতের জল এখনো নামেনি। বিলেন জমি তার। কখনো কখনো পৌষমাস পর্যন্ত এসব ক্ষেতে জল জমে থাকে। ক্ষেতের ধান জলে কাদাতেই অধিক নষ্ট হয়ে যায়। হোসেনের দুশ্চিন্তার অবধি রইল না; সেদিন বাড়ি ফিরে জরিনাকে বললে, ফসল এবার কিস্‌সু হয়নি বউ—

দাওয়ায় বসে জরিনা খাবার জন্য শাপলার আঁশ ছাড়াচ্ছিল, তার দিকে না তাকিয়েই ব্যঙ্গের সুরে বললে, খোদাতালার দয়া!

হোসেন বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল; ঘৃণা, রোষ এবং আতঙ্ক একসঙ্গে মিশে তার মুখচোখ অদ্ভুত হয়ে উঠল। জরিনার মুখে এতটুকু দুশ্চিন্তা যেন নেই। ঠাণ্ডা নিষ্কম্প ব্যঙ্গে শুধু যেন ঠোঁটের কোনটা একটু কুঁচকে উঠেছিল।

দুপুররাতে করিমের ডিঙির সাড়া পাওয়া গেল, নিশীথের অভিযানে হয়তো গ্রামান্তরে চলেছে। হোসেনের চোখে ঘুম ছিল না। একে সেদিন গেছে একরকম উপোস, তার ওপর ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা এবং জরিনার তাচ্ছিল্য মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে তুলেছিল। সে একহাতে ভর দিয়ে উঠে পাশে শোয়া জরিনাকে একবার দেখে, তার নিশ্বাসের শব্দ পরীক্ষা করে, আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। জরিনা সুষুপ্ত। —চুরি করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, যার জন্য করিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে

জরিনার কাছে খাটো হয়ে থাকবে। যখন খুশিই হবে এতে—হোসেন আজ জরিনাকে দেখিয়ে দেবে যে সেও ইচ্ছে করলে ওসব কাজ পারে, কিন্তু মন সায় দেয় না এই যা। চুপি চুপি বেরিয়ে আড়া থেকে একগাছা দড়ি খুলে নিয়ে, চালে গোঁজা বৈঠাখানা নামিয়ে সে উঠোনের অন্ধকারে মিশে গেল।

শেষরাত্রে এসে জরিনাকে আস্তে আস্তে জাগাল, বউ, আয় এদিকে—তার কণ্ঠে যেন মহাকীর্তির সুর। বিস্মিতা জরিনা তার পিছু পিছু খাল পাড়ে গিয়ে দেখলে, খালের ওপর নুয়ে পড়া কাঁঠাল গাছটার কোলে হোসেনের ডিঙিখানা সামনের ঘাট জোড়া নারকেল বোঝাই হয়ে ভাসছে। স্বল্প জ্যোৎস্নায় হোসেন দেখল জরিনার সমস্ত মুখখানা খুশিতে ঝলোমলো হয়ে উঠেছে।

—কোথা থেকে আনলে ?

ছেলেমানুষকে অন্যায় কৌতূহলে নিরস্ত করবার মত ভারিক্কীচালে হোসেন জবাব দিলে, তোমার কাজ কী ; এখন এসো দেখি এগুলো তুলে রাখি, কাল হাটে বিক্রী করা যাবে।

পরদিন দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে হোসেনের কাছে গতরাত্রির ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী মনে হতে লাগল। এমন কী নারকেলগুলো বিক্রী করে সে চাল কিনে এনেও, মুখ ভারি করে বসে রইল। তারপর ভাতের থালা সামনে নিয়ে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে ইতস্তত করতে লাগল সে। এক সময় করুণ গলায় বলে উঠল, বউ, পাপের ভাত যে মুখে উঠতে চায় না, কোনো অমঙ্গল হবে নাতো, অ্যাঁ ? জবাবে, জরিনার লঘু হাসিতে তার ব্যাকুলতা খানিকটা হালকা হোলো সত্যি, কিন্তু কেবলই তার মনে হতে লাগল যে ভাত নয়, সে সজ্ঞানে এক এক গ্রাস পাপই মুখে দিচ্ছে। তার ঐ করুণ অবস্থা দেখে জরিনা অকস্মাৎ

মায়া অনুভব করল। কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে হেসে বললে, আরে দ্যুৎ, এতো ভাবছো কী, এরকম একটু আধটু আজকাল না করে কে?

সেদিন সারাটা দিনমান ধরে জোর বৃষ্টি। সন্ধ্যার দিকেও ছিটে-ফোঁটা ঝরতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ করে দম্‌কা বাতাস। দক্ষিণ দিক থেকে একটা দৈত্য যেন বারবার ফুঁসে আসতে চাইছে। —আসন্ন বন্যার সংবাদ।

সন্ধ্যার সময় করিমকে তাদের বাড়িতে আসতে দেখে হোসেন একটু বিস্মিতই হোলো। যথারীতি অভ্যর্থনার চেষ্টা করে করিমকে দাওয়ায় বসাল। করিম মিটি মিটি হেসে বললে, কাল আমার চোখকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারনি হে! বলে, ভাঙা গলায় হো হো করে খানিকটা হেসে গলা নামিয়ে, আবার বললে, তা নেমেছই যখন ইদিকে—পুঁটি খলসে মেরে কী হবে, তার চেয়ে বরং এসো রুই-কাতলা মারবার চেষ্টাই করি।

প্রথমটা বিব্রতলজ্জায় গোপনের একটু হাঁ-না চেষ্টা করে, অবশেষে চোখ নিচু করে হোসেন শুধাল—কী রকম?

—বড়োদরের কাজের কথা বলছি। না খেয়ে মরছি আমরা অথচ আতাগর মুন্সীর ঘরে কতো চাল আছে জানো? একসের চাল তার কাছে ধার পাওয়া যায় না। যাবে আজ আমার সঙ্গে তার কিছু নামিয়ে আনতে?

—ডাকাতি, চমকে উঠল হোসেন।

—না না, ডাকাতি কেন, সিঁধ কেটে কিছু নামিয়ে আনবো। সুখীর ঘরের পেছন দিকেই গোলা, কী করতে হবে না হবে সব আমি ভেবেই রেখেছি। কিন্তু একজন সাথী না হলে ভারি মুস্কিল!

করিমের মুখের ভাবটা এমন যেন একাজে বেশ গৌরব আছে এবং না করলেই নয়। হোসেন আড়চোখে একটুকাল তাকে দেখে ভাবতে লাগল, কী বলবে। অসম্ভব, চুরি করা অসম্ভব তার পক্ষে। চোর—সমাজে সবাই যাকে নিন্দা করে, আঙুল দেখিয়ে হো হো করে হেসে টিটকারী দেয়, কাঁধের ফেরেশতা যার অন্যায়ের ফিরিস্তী লিখে লিখে খোদার দরবারে দুঃসহ শাস্তির ব্যবস্থা করায়—কিছুতেই সে পাপে আর নামবে না হোসেন। ছিঁচকে চোর করিম, গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা করিম চোরা বলে জানে, তার স্তরে কিছুতেই সে নিজেকে আর নামাতে পারবে না। একটু ইতস্তত করে বললে—না ভাই আমার সাহস হয় না!

—বাঃ ভয় কিসের! এমন কৌশল শিখিয়ে দেবো যে ধরাপড়ার কোনো ভয়ই থাকবে না।

—না, মানুষের চাইতেও বড়ো কথা যে খোদার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। পাপে পাপে এমে মরছি, তার ওপরে আরো বোঝা বাড়াবো না।

করিম সহসা কোনো কথা বলতে পারল না। হোসেনকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে কেমন অদ্ভুতভাবে বললে পাপ?—অ্যাঁ?—

হোসেনের অটল সংকল্প দেখে করিম অবশেষে চলে গেল। জরিনা এতোক্ষণ ঘরের মধ্যে ছিল, বাইরে এল এবার—কী বলছিল করিম? কানপেতে এতো শুনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তোমাদের যে ফিসফিসে কথা!

হোসেন তীক্ষ্নচোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার উঠোনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। মুখচোখ তার চিন্তান্বিত।

—বাপরে বাপ, ঘরের মধ্যে শব্দ করে বারবার তোমায় এতো ইশারা করলুম, তুমি খেয়ালই করলে না! আমি কতো কষ্ট করে বনবাদাড়

ভেঙে ওবাড়ি থেকে পান আনলাম কিন্তু দেওয়াই হোলো না !

হোসেন চকিত চোখে আর একবার তাকালে জরিনার দিকে। কিছু বললে না।

ঘুম এলো না চোখে। মাথায় নানা চিন্তা। কী করবে সে, কী করবে ? উপবাস আসন্ন—আসন্ন মৃত্যু, এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কী তার ! ভেবে ভেবে হোসেনের মাথা গুলিয়ে যেতে থাকে।

বাইরের ডোবায় ব্যাঙ আর পোকামাকড়ের একঘেয়ে ডাকাডাকি। অন্ধকার আর মাঝে মাঝে বন্যার জোলো হাওয়া। বন্যা হলে ফসল মারা পড়বে। মারা পড়বে সেও। উপায় আছে পরবাসী হয়ে 'ভাঁটি'তে যাবার। কিন্তু অতো দূরে নিরালা সমুদ্র কিনারার ক্ষেতে সে কেমন করে দিন কাটাবে ? খেলো কী খেলো না, না অসুখেই পড়ে রইল—কে তার খোঁজখবর নেবে ? ভাঁটির অধিকাংশ জমিরই মালিক মগেরা। পরবাসী রেখে মজুর খাটানো ছাড়া আর কোনো সংশ্রবই তারা রাখে না। জরিনার স্নেহস্পর্শব্যাকুল হোসেন কেমন করে দিন কাটাবে সেখানে ! কিন্তু এখানে থেকেই বা উপায় কী ! জরিনা তার চাইতে হয়তো আজই বেশি শ্রদ্ধা করে করিমকে—করিমের কথা বলতে বলতে ভাবে যেন ডগমগ করে তার সারামুখ—

জরিনা পাশে শুয়েছিল, একটু উসখুস করে হোসেনকে ঠেলা দিয়ে বললে, ঘুমাইছ নাকি ?

—না।

—ঐ সমস্ত আজে বাজে চিন্তা কোরো না। বন্যা হবে না দেখো। বর্গা ক্ষেত আর নিজেদের জমি থেকে যা পাবো তাতে বছর একরকম চলে যাবে। আর যদি ভাঁটিতে যাবার একান্তই দরকার পড়ে, সে সময় ভেবেচিন্তে যাহোক একটা উপায় করা যাবে। কিন্তু তা গেলেও

না হয় যাবে অঘ্রাণ মাসে কিন্তু এখন করবে কী?—তাইতো ভাবছি—

—তাহলে আমি যা বলি শোনো, আজ রাত্রে বেরোও না আরএকবার—এ রকম রাত্রেই তো সুবিধা!

হোসেন খানিক নীরব থেকে নড়েচড়ে শুলো—না বউ শরীরটা ভালো নেই, এই শীত, তার ওপর গাছগাছালি বৃষ্টিতে পিছল, বেরোতে পারবো না।

—না পারলে উপায় কী শুনি? এরকম ফ্যান ক্ষুদ খেয়ে কদিন আর জান রাখতে পারবে?

—যে কদিন পারি। বৃষ্টিতে গাছ পিছল বাইতেই পারবো না!

—পোলাপানের মত কথা বোলো না—যাও নাওডা নিয়ে এট্টু ঘুরে এসো। এ রকম না খেয়ে আর কদিন থাকবো?—করিম খাঁ তো পিছল বলে ঘরে বসে নেই, সে কখন সেই বেরিয়ে গেছে—

আবার হোসেনকে সেই চরমতম আঘাত। এবার সে আর চুপ করে থাকতে পারল না—দ্যাখ বউ, রোজ রোজ করিম চোরার নাম নিয়ে কানের কাছে এমন ব্যাজোর ব্যাজোর করবি না। শরীরটা ভালো নেই, সহ্য করতে পারবো না।

—চোর না কে, শুধু করিমের নাম কেন; গু খায় সব মাছে নাম পড়ে পাঙ্গাশের। গ্রামের মাতব্বরেরা কি করে? জবান খাঁ কী শয়তানী করে তোমার দু'কুড়া জায়গা নিয়ে নিলো কিন্তু সেজন্য তাকে চোর বলার সাহস আছে তোমার? এখন তো নুয়ে পড়ে সালাম দাও—করিম চোরাও যে অমন—

—থাম। তোর এতো সাধ হয়ে থাকলে নিকা করগে তাকে।

জরিনা এতোবড়ো জবাব প্রত্যাশা করেনি। খানিকক্ষণ বিস্ময়ে গুম হয়ে থেকে বললে—ছিঃ ছিঃ, তোমার জবানডা এমন খারাপ হোলো শেষে। পাগলের মতো যা ইচ্ছে তাই বলছো—

হোসেন তার কথায় বাধা দিয়ে পাগলের মতোই চুলের মুটি ধরে গালে একচড় কষিয়ে দিল—এই হারামজাদী, কাকে পাগল বললি তুই ? যা তুই করিম খাঁর সঙ্গে নিকা বোসগে যা। আমি চুরি করে তোকে খাওয়াতে পারবো না।

জরিনা তো হতভম্ব—যে বিশ্রী ব্যাপার হোসেন কল্পনা করেছে তা ওর মন থেকে কেমন করে ঘুচিয়ে দেবে ভেবে না পেয়ে দুঃখে অভিমানে তার দুচোখ ফেটে ধারা নামল। বিছানার একপাশে সরে সে চুপ-চাপ শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। গায়ে দেবার একখানা মাত্র পুরু কাঁথা, সেখানা রইল হোসেনের গায়ে।

ঝোড়ো বাতাস যেন সমস্ত অন্ধকারকে টেনে নিয়ে এসে গ্রামের বুকে জড়ো করছে। অনেক রাত পর্যন্ত হোসেনের চোখে ঘুম এল না। জরিনার উপর এই দ্বিতীয়বার হাত তুললে সে। আর একবার মেরেছিল বহুদিন আগে, সেবারে কেবলমাত্র বিয়ে হয়েছে তাদের, হোসেনের মা তখন জীবিতা—কী এক ঝগড়া-ঝাঁটি উপলক্ষ করে সে দুম দুম করে কিশোরী জরিনার পিঠে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিয়েছিল ; জরিনাতো সেজন্য তিনদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে কোনো কথাই বললে না। অবশেষে হাট থেকে রঙীন ডুরে শাড়ি কিনে তাকে মানভঞ্জন করতে হয়েছিল। আজো হোসেনের অনুতাপ হোলো। খানিক পরে নরম গলায় ডাকলে, বউ !

জরিনা নীরব। হোসেন আবার ডাকলে—বউ, দোহাই তোর, রাগিসনি—মনটা ভালো নেই !

তবু জরিনার দিক থেকে কোনো সাড়া এল না। হোসেন তার কাছে সরে কনুয়ে ভর করে গালে হাত বুলিয়ে বললে—দোহাই খোদার, কথা বল বউ। খুব লেগেছে, না ?

জরিনা ঝটকা দিয়ে হাতখানা সরিয়ে দিল। আহতমনে আবার সরে এল হোসেন।

অনেকক্ষণ বাদে উঠে যখন সে বৈঠা হাতে দাওয়ায় নামল, তখনো তার মনে মনে আশা এবার জরিনা তাকে পিছু ডেকে বলবে—থাক, আজকের রাতটা সত্যি খারাপ, বেরিয়ে কাজ নেই!

কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করেও যখন কোনো ডাক এল না পেছন থেকে, হোসেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠোন পেরিয়ে খাল পাড়ে বাঁধা তার নৌকার শিকল খুললে। কোথায় কোন দিকে যাবে, কিছুই সে স্থির করেনি। কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে সে ডিঙি ভাসিয়ে দিলে।

সত্যিই তো! কে কার! আর কীই বা পুণ্য-পাপ! অসৎ নয় কে? সবাই যাকে মাথায় তুলে নাচে সেই জবান খাঁই বা কী? এই জগতে বাঁচাটা বড়ো কথা, না খোদার ওপর নির্ভর করে থাকা? নির্ভর করে করে সে তো আজ মরণের মুখে এসে পৌঁচুচ্ছে। স্ত্রী পর্যন্ত আজ হেলা করে। অথচ জরিনা কী একদিন কম ভালোবাসত তাকে। তাকে কাছে পেয়ে তারো মুখ কী একদিন ডগমগ করে উঠত না? এই গাঁয়ের লোক, তারা তো আজ তাকে মনিষ্যির মধ্যেই গণ্য করে না, কিন্তু দিনকাল যখন ভালো ছিল সেও কী খাতির কম পেয়েছে? আজ তবে কেন এমন তোলো? কেন সে এমনভাবে মরবে—আতাহার মুন্সীরা কেন করবে না দয়া? অসংলগ্ন ভাবনা হোসেনের মাথাটাকে যেন আরো ঘোলাটে করে আনে। সে যদি আজ এমনি করে না খেয়ে মরে তবু কারো বুকে ব্যাথা লাগবে না। জরিনাও হয়তো হাঁফ ছেড়ে করিমের ঘর করতে যাবে। খোদা চিরকালেরই মতো মূক থাকবে। কেউ কাঁদবে না হোসেনের জন্য।

হঠাৎ হোসেনের কান্না পায়। কী রকম একটা রুদ্ধ উষ্ণ অনুভূতি বুকটাকে তোলপাড় করতে থাকে।

জোয়ারের টানে নৌকো তখন সামনে ভেসে চলেছে। আশে পাশে বেতঝোপ, হোগলাবন। চারিদিকে আলকাতরার মতো অন্ধকার। অন্ধকার যেন হোসেনের মাথার মধ্যেও। ঠোঁটের ওপরকার নোনা-জল চেটে হোসেন কঠিনমুখে প্রতিজ্ঞা করল—যার অভাবে সে আজ এতো রিক্ত, যার জন্য প্রিয়তমা পত্নীর ভালোবাসাটুকুও সে হারাতে বসেছে, যে করে হোক এবার সে তা যোগাড় করবেই। দয়া করবে না ঈশ্বর, দয়া করবে না মানুষ। যে করে হোক বাঁচতে তাকে হবেই।

চোখের জল মুছে, বৈঠাকে শক্ত হাতে ধরে সে নৌকোর মুখ আতাহার মুন্সীর বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিল।

# জাহাজঘাটের কুলি

ভিখিরি কুলির মতো ঘাটে খেটে আর সুখ ছিল না।

শরতের শিউলি মাজা সকাল। চার নম্বর ঘাটের আড়ালে খুলনা এক্সপ্রেস ষ্টিমারের আগমনী সিটি বেজে উঠেছে। সাড়া পড়ে গেছে প্রকাণ্ড ষ্টেশনে, কুলিরা ছুটেছে—প্রতীক্ষমান বিচ্ছিন্ন জনপুঞ্জ মিলিত স্রোতে তিননম্বর ঘাটের দিকে এগিয়েছে। তখনো শফিক একটা সোনালি গাছের বাঁধানো বেদীর ওপর শুয়ে বিড়ি ফুঁকছিল।

রাতজাগা দেহে প্রলেপের মতো অবসাদ জড়িয়ে আছে। কাল সারারাত্র কোম্পানির কুলিদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে মেইলে মাল ভর্তি করে দিয়েছে। এখন শরীরে এতো ক্লান্তি যে এগিয়ে গিয়ে ঘাটে দাঁড়াতে একেবারেই সে উৎসাহ পাচ্ছে না। তাছাড়া কালকের রোজগারি ন' আনা পয়সা ট্যাঁকে রেখে ঘুমিয়েছিল, ভোরে চা খাবে মনে করে পয়সা খুঁজতেই দেখে ট্যাঁক শূন্য। পাশে শুয়েছিল ইয়াসিন, হয়তো সে-ই মেরে দিয়েছে। মনটা তাতে আরো দমে পড়েছে। সকালে আজ আর কিছু পেটে পড়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ এদিকে পেটেও পাক দিয়ে উঠেছে।

ঘাটে কুলিদের কলরব। লম্বা ফ্লাটের পাশে ষ্টিমার ভিড়েছে। ধূমায়মান চোঙটা কালো করে দিচ্ছে পরিষ্কার আকাশ। ফ্লাট আর পাড়ের মাঝেকার পুলের এপাশে সারি বেঁধে বসে গেছে কালো জামা পরা তকমাওয়ালা কোম্পানির কুলিরা; তারপরে দাঁড়িয়েছে ইয়াসিন, নিতাই, গফুর, মাধব—তাদের মতো অচিহ্নিত আরো অনেক ছোকরা কুলি, ভিখিরির ছেলে। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে শফিক সেদিকে পা বাড়াল।

বরাবর এমনি পিছনেই এককোণে ভিড় করে ওরা দাঁড়ায়। সামনে যাবার চেষ্টা করে না, পারেও না। একে ওদের চোখ রাঙানি, ধাক্কা, তার ওপর সবচেয়ে ভয়ানক সর্দারের সেই লিকলিকে সাপের জিভের মতো বেতের ঝলক। বন্ধ গেটের এপাশে ঠেলাঠেলি কোলাহল করে ওরা দাঁড়ায়। সর্দারকে দেখে সবাই পথ করে দেয়। যেতে যেতে সে তাকায় ডাইনে-বাঁয়ে, গম্ভীর চোখে। খাটো হাফশার্টে ঢাকা পাতলা একটি মানুষ, কপালে ফোঁটা, মুণ্ডে উৎকলি টিকি, কোটরে ঢোকা পিট পিটে দুটি চোখ। ওকে সর্দার বলতে বাধে; কিন্তু ওরই ঐ চোখ দুটো এক সময় ভাঁটার মতো বেরিয়ে এসে হিংস্র জ্বালা বিচ্ছুরণ করে; শীর্ণ হাতের ঐ সরু বেতখানাই অতি বিষাক্ত সরীসৃপের ছোবল থেকেও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

—সেলাম।

যেতে যেতে এক লহমা তাকাল সর্দার—আবার এসেছিস তুই? বললে শুনবিনে, তোদের জন্য কোম্পানির কুলিরাও—বিড়বিড়িয়ে গেট খুলে সে ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শফিক-এর 'সেলামে' ইয়াসিন, নিতাই ওরা হাসছিল। শুধু সেলাম দিয়ে সর্দারকে খুশি করা যে সম্ভব নয় সে ওরা দীর্ঘদিন এখানে থেকে বুঝেছে। ঐ চোখে ঝরবে কৃপাদৃষ্টি! মরাগাছে সবুজ ফলের দোলানির মতোই অসম্ভব। ইয়াসিন বললে—তোমার এমন ভালোমানষী মর্দ, ঘাটে কাজ করতে আসা তোমার উচিত হয়নি।

শফিক কুণ্ঠিতভাবে ছোট্ট একটু হেসে জবাব দিল। তার চরিত্র যে এক নিতাই ছাড়া আর ওদের কারু সঙ্গে মিল খায় না, তা সে জানে। বেশ একটু আহত মনেই তাই দূরে দূরে থাকে। স্বল্পমোটের যাত্রীরা একে একে নেমে যাচ্ছিল, ছোকরা কুলিগুলো যথারীতি হাত

বাড়িয়ে হাঁকতে লাগল—কুলি, কুলি লাগবে বাবু? এসব যাত্রীরা বড়োজোর রিক্সাষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যায়, কেউ কেউ বাড়ি পর্যন্তও নিয়ে যায়, দুটো চারটে পয়সা দিয়ে ছোকরাদের খুশি করে দেয়—তারা বাদে ওসব ছোটখাটো মোট কেউ ছোঁয়ও না। হুকুম হতেই কোম্পানির কুলিরা দুদ্দাড় করে ছুটল। এলোমেলো জীবনযুদ্ধের পদাতিকেরা। কার কনুয়ের ঠেলায় রেলিং-এর পিছনে ছিটকে পড়ল একজন যাত্রী। সর্দার ক্ষেপে গেল। হাতের চক্‌চকে বেতখানা বারবার কচিরোদে ঝলসে উঠতে লাগল। সপাসপ-সপাসপ বেত আর থামে না। ওরা একটু হটে আবার সে-বিদ্যুৎবৃষ্টি উপেক্ষা করেই ছুটল। কে শোনে সর্দারের গালি, আর কে-ই বা দেখে তার বেতের ঝলক!

মাগো! আর্তনাদ করে বসে পড়ল রোগা উড়ে-কুলি মাধব। শফিক থমকে আবার দেখল, আহত অঙ্গে হাত বুলাতে বুলাতে মাধব কেঁপে কেঁপে বসে পড়েছে। রক্তশূন্য গালে নীল দুটো দাগ বসে গেছে। দেখার সময় ছিল না, মাধবকে টেনে তুলে শফিকও ছুটল।

ষ্টেশনের বিস্তৃত প্রাঙ্গনটুকু তখন কোলাহলে ভরে উঠেছে। রিক্সা ঘোড়ার গাড়িওয়ালা শহরে যাত্রী খুঁজছে; ষ্টিমার থেকে খবরের কাগজের বাণ্ডিল নামিয়ে হকারেরা পূজাসংখ্যার আগমন ঘোষণায় তৎপর। স্বজনের অপেক্ষা-অধীর জনতা ফ্লাট নির্গত প্রতিটি যাত্রীর মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছে।

শফিক ভিতরে চেয়ে দেখে—প্রায় সব মোট ধরেই একজন না একজন কোম্পানির কুলি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ছুটোছুটি করে হয়তো সেও একটা মোট ছুঁয়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের ধমকে সরে আসতেই হবে। তারা পাবে ওদের উচ্ছিষ্ট বা অতিরিক্ত মোট। সেদিন যাত্রী ছিল প্রচুর, সুতরাং তার নিরাশ হবার কারণ ছিল না। ঘুরে খুঁজতে লাগল

শফিক। এককোণে এক অল্পবয়সী বাবুর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধেছে পাশের কুলি নাথুর।

—ওয়েটিংরুমে নিতে আট আনা দিতে হবে ? এইটুকু জায়গা দু আনায়—

সেদিন নাই বাবু, জিগ্‌গাস করে দেখেন ওদের, আট আনার কম কেউ নেবে না—বলতে বলতে রেলিংএর সঙ্গে হেলিয়ে দাঁড়িয়েছে নাথু।

আচ্ছা তুমি যাও—অন্য একজনকে ডাকলেন ভদ্রলোক। নাথুকে দেখে সে নিরুত্তরে অন্যত্র ছুটল।

শফিকের ডাক পড়ল—কতো নেবে এই মোট ওয়েটিংরুমে নিয়ে যেতে ?

ধূর্ত নাথুর দিকে তাকালে শফিক—এর মধ্যেই নাথুর চোখে খবরদারী ফুটে উঠেছে। কিন্তু একটা হয়তো বলে বসতো শফিক, কিন্তু সামলে নিল। এ ঘাটের পাট তাহলে ফুরুলো। শুধু ওর ওই পেশী-বহুল হাতের মার নয়, সর্দারের কানেও সে খবর পৌঁছে যাবে, যার অর্থ তার পাসের কুলি হবার সমস্ত সম্ভাবনা চুরমার হয়ে যাওয়া।

আমি পারব না বাবু।

আরেকটা মোটের কাছে এসে দাঁড়াল সে। সেটা ধরে দাঁড়িয়েছে ইয়াসিন। শফিক ফিরছিল, হেনকালে মালিক ডাকলেন—এই তুই পারবি যেতে ?

এ ক্ষেত্রেও মারের ভয় আছে সত্যি, কিন্তু তবু কি খেয়াল করে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবেন ?

আলেকান্দা, কতো নিবি ?

মোট দেখে শফিক বললে কুলি যে দুজন লাগবে। আট আনা করে দেবেন।

ইয়াসিন সামনে এগিয়ে এল—দেখলেন অন্যায় চেয়েছি আমি?

ছ' আনায় যাবি তো চল।

পারবো না বাবু,—কেবিনের দেয়ালে ইয়াসিন ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। এমন সময় নিতাই কোথা থেকে ছুটে এল—কোথায় যাবেন বাবু?

আলেকান্দা, ছ'আনায় যাবি?

নিতাই ইয়াসিনের দিকে এক লহমা তাকিয়ে বাবুর মুখচেয়ে বলে উঠল—ঐ সাত আনা করেই দিন বাবু, আয় শফিক তোল—

বাবু কোনো বাধা দেবার আগেই নিতাই শফিক-এর মাথায় একটা বাক্স তুলে দিল। ডেক প্রায় খালি হয়ে গেছে তখন, ভালমানুষী করে আর মোট ছাড়া চলে না। ইয়াসিন প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল। ওরা দুজনেই ততোক্ষণে মোট তুলে নিয়েছে।

—আচ্ছা শালা পরে দেখা যাবে। নিতাইকে শাসিয়ে ইয়াসিন অন্য দিকে ছুটে গেল। শফিক কিন্তু মনে মনে খুশি হয়ে উঠল—আচ্ছা জব্দ হয়েছে ইয়াসিন। নিতাইয়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে—ভাবিসনে নিতাই, চল।

আরে দূর, ভাবাভাবি আবার কী, সেদিন ঢাকা মেলের একটা মোট এমনি করে ছিনিয়ে নেয়নি ইয়াসিন? বাবুকে আগে যেতে বলে নিতাই অনুসরণ করল, পয়সার কারবার! চল, এগো তুই।

যাত্রিরা প্রায় সবাই তখন নেমে যাচ্ছে, ইয়াসিনের আর মোটের আশা নেই। সামনে তার অবস্থা কল্পনা করে শফিক নিতাইয়ের ওপর খুব খুশি হয়ে উঠল।

দশটার মধ্যে অন্য কোনো স্টিমার নেই। দুজনে পাড়ার মধ্যে এদিক ওদিক আরো আনা দুই রোজগার করলে। তবু খাওয়ার

জন্য নিতাইয়ের কাছ থেকে শফিককে ধার করতে হোলো। খেয়ে দেয়ে ভাবছিল পাসের কথাটা সর্দারকে আর একবার মনে করিয়ে দেবে কি না। নিতাই বলছে—পকেটে কিছু দিতে না পারলে শুধু শুধু বলা বৃথা। কিছু হাতে থাকলে দিতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু গত দুটি মাস যাবৎ এই স্টেশনে খেটেও কিছুই সে জমাতে পারেনি। কী করবে তবে?—ভাবতে ভাবতে লোকারণ্য অপেক্ষা-কক্ষে ঢুকে এক কোণে বসার উপক্রম করতেই দেখতে পেল নাথুর সেই যাত্রী-বাবুটি সুটকেশের ওপর বসে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন; চোখাচোখি হতেই তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন, কুলি নও তুমি?

শফিক ঘাড় নাড়লে।

ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—তবে আমার মোট নিলে না কেন?

—কম বললে ও পরে মারত, তা ছাড়া আমি তো কোম্পানীর কুলি নই। ওরা থাকতে কোনো মোট আমরা ধরতে পারি না। এমনি ছোটখাটো ওদের না ধরা মোট বই।

—ওঃ।—খানিক পরে আবার প্রশ্ন করলেন—আজকাল স্টিমার কমিয়ে দেওয়ায় তোমাদের রোজগার তো অনেক কমে গেছে, না?

শফিক ম্লান মুখে হাসল, বললে—দুবেলা খাবার পয়সাও জোটা ভার। বলতে বলতে মনে পড়ল তার সেদিন আর মাদারীপুরের স্টিমার নেই। দশটা বারোটার আশা গেল। বিকেল পাঁচটায় ভবানীগঞ্জ, আর রাত্রে আছে খুলনা মেল। রাত্রের খাওয়ার পয়সাও নিতাইয়ের কাছ থেকে ধার নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

—কোম্পানীর পাস না পেলে আর এ কাজ করে সুখ নেই বাবু।

—কেন, এই তো দিব্যি আছো, তকমা বেঁধে কুলি নাম নাই বা কিনলে!

তার কথায় সন্তুষ্ট হোলো না শফিক। মুখ ফিরিয়ে পাশের পুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঝিলমিল করে জলের ওপর রোদ নাচছে, যেন জল নয়—গলন্ত রুপো। ওপাড়ের ঘাটে বাসন মাজতে নেমেছে কে একটি মেয়ে। তার আশেপাশে নানা গলার কলরব। অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়ল শফিকের, নিতাই তো ঠিকেদারবাবুর বাড়ি যাবার কথা বলেছিল। তাকে খুঁজে নেওয়া দরকার। উঠে যাচ্ছিল সে, ভদ্রলোকের ডাকে ফিরে দাঁড়াল।

—এখানে কাছাকাছি কোনো হিন্দু হোটেল আছে বলতে পার?

—বাঃ, ঐ তো পাশেই—আপনি নতুন আসছেন বুঝি এখানে? ঢাকার জন্য অপেক্ষা করছেন? বেশতো নেয়ে খেয়ে হোটেলেই বিশ্রাম নিতে পারবেন, যাবেন?

—চল। ব্যাপার কী জানো, নতুন এসেছি এখানে, ভবানীগঞ্জ স্টিমারে আমার কয়েকজন আত্মীয়, মানে আমার কাকারা আসবেন। তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে আবার ঢাকা যাবো। অসুবিধার ভয়ে আমি বরগুনা থেকে একটু আগেই এসে পড়েছি—যেতে যেতে বলছিলেন ভদ্রলোক—ভবানীগঞ্জ এলে তুমি আমাকে খবর দিও; আরো একজন লোক ঠিক রেখো, মোট তোমাদের দিয়েই নামাব। আমার নাম অজিতবাবু, স্টিমার এলেই আমার খোঁজ কোরো।

অজিতবাবুকে হোটেলে বন্দোবস্ত করে দিয়ে চেনা পানবিড়ির

দোকান থেকে একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিতাইকে এদিক ওদিক কয়েকবার খুঁজে এল। স্টিমার আপিসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবল ঢুকে ঠিকেদারবাবুর কাছে তার নিবেদনটা জানিয়ে আসবে নাকি? কতদিন সে আপিসের সিঁড়িতে কয়েক পা উঠে আবার নেমে এসেছে। ভেবে ভয় পেয়েছে যে, উপরে উঠেই হয়তো দেখবে কয়েকটা লালমুখো সাহেব চোখ কটমট করে তার দিকে তাকিয়েছে। হুটমুট করে কী বলে উঠবে কে জানে! ঘাড়ধাক্কা দিয়ে হয়তো চাপরাসী দিয়ে নামিয়ে দেবে। রোজই স্টিমার আপিসের দিকে শফিক এই কথাটি ভাবে আর সাহস হারায়। বাড়ি ছাড়া ঠিকেদারবাবুকে আর অন্য কোথাও পাবার উপায় নেই। সর্দার সর্বদা তাকে ছায়ার মতো আগলে থাকে।

নিতাইকে খুঁজতে খুঁজতে দু'নম্বর ফ্লাটে উঠে এল শফিক। বস্তা বস্তা চালডালে তার পেট ঠাসা—এখানে আসা অবধি শফিক এই ফ্লাটটাকে এই ভাবে দেখে আসছে। এতো রয়েছে, তবু বারো আনার কমে কোনো হোটেলে খাওয়া নেই। একটা বস্তার উপর সে আরাম করে বসল। ঘাটে কোনো স্টিমার নেই, সামনের কবাটটা খোলা। চিকচিক করে ভাঁটায় নেমে যাচ্ছে কীর্তন-খোলা। ওধারে পাল তুলে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েক খানা মহাজনী নৌকো। খেয়া নৌকো ওপাড়ে পৌঁছে পুলের কাছে যাত্রীদের উজাড় করে দিচ্ছে, চর কাউয়া মাদ্রাসার বারান্দায় আনা গোনা করছে দু'একটি ছাত্র। তাকিয়ে থাকতে চোখে কেমন লাগে। চোখ ফেরাতেই দেখল একটা বস্তার নিচে গামছা পেতে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াসিন; ডানহাতের লোহাটা সন্তর্পনে খোঁচা দিচ্ছে এক একটা বস্তার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটো দিয়ে তার গামছার

ওপর স্বর স্বর করে চাল ঝরে পড়ছে। কাছাকাছি কেউ দেখছে না তার চুরি। শফিক চোখ ফিরিয়ে নিল।

ফ্লাটের গা ঘেঁসে একটা পানসী চলে গেল। ভিতরে বসা একটি মেয়ে, হয়তো কোনো বৌ, পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ফ্লাটের দিকে বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ভানুর কথা মনে পড়ে গেল শফিকের। চার নম্বর ঘাটের কাছে মাঠের পাশে ডেরা বেঁধেছে তারা। তিনটি লোক, বুড়োবুড়ি আর ওই তেরো বছরের নাতনী ভানু। আকালের সময় ওরা দেশ ছেড়ে শহরে এসেছিল; কিছুদিন লঙ্গরখানায় খেয়ে তারপর বুড়ো শুরু করেছিল দারোয়ানির কাজ। এখনো তাই করছে। মাঝে মাঝে মোট বয়। একদিন তাকে সাহায্য করার সূত্রে তার সঙ্গে আলাপ। বুড়োর নিমন্ত্রণে তাদের ওখানে গিয়ে ভানুকে দেখেছিল। দেখে মুগ্ধ হোলো; অমন বুদ্ধিমতী সুন্দর মেয়ে আর তার চোখে পড়েনি। আশ্চর্য সুন্দর তার দুটি বড়ো বড়ো চোখ। মনটা যেন সেইদিনই ওখানে বাধা পড়ে গেল। কিন্তু তার পরিচয় জানবার পর ভানু ঠোঁট উল্‌টে তাকে করল অবজ্ঞা। ভিক্ষে করে খায় বটে কিন্তু দেমাক ভারি তার। শফিককে ভেবেছে তাদেরই মতো ছন্নছাড়া ভিখিরি। শফিক সত্যি তাতে দুঃখ পেয়েছে। আজ না হয় ছন্নছাড়া, কিন্তু কোম্পানীর পাস পেলে সে কী শ্রীমন্ত হয়ে উঠতে পারবে না?

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দাঁড় ফেলে জেলে নৌকোগুলি ফ্লাট ঘেঁসে চলে যাচ্ছে। সারা দুনিয়া ঝলমলাচ্ছে রোদে, ঘন নীল আকাশে ছড়ানো কয়েক টুকরো শাদা মেঘ। চর কাউয়ার সবুজ বনানীর ওপর চক্রাকারে কতোগুলি শকুন উড়ছে, হয়তো কোথাও ভোজ বা মড়ক দেখেছে। প্রবহমান

কীর্তনখোলা ছল ছলাৎ শব্দ তুলছে ফ্লাটের গায়ে—তার জলের দিকে তাকিয়ে থেকে শফিকের চোখ এক সময় তন্দ্রালু হয়ে এল। কতোটা গহীন এই নদী? ছেলেবেলায় গল্প শুনেছে নদীর গর্ভে ঐশ্বর্যের অন্ত নেই; স্মরণাতীতকাল থেকে কতো নিমজ্জিত ধনসম্পদ ওর মাঝে সঞ্চিত হয়ে আছে—তলায় পৌছে আজ পর্যন্ত কেউ তার নাগাল পায়নি। শফিকের মনে হোলো, সে অতি নিচে, বহুদূর নদীর তলায় চলে গেছে, সেখানে স্রোত নেই, কাদা নেই, চারদিকে ধবধবে নরম বালি। আর তারই ওপরে—ও কি?—ছড়িয়ে আছে অপূর্ব দ্যুতিময় কতো নাম-না-জানা জিনিস, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে ভেবে সে অস্থির হয়ে উঠছে। এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই নাম-না-জানা জিনিসগুলো আর কিছুই নয়—অজস্র কোম্পানীর 'পাস'। হ্যাঁ, পাসই বটে, তেমনি লম্বাটে গোল কোম্পানীর নাম লেখা নম্বর দেওয়া লোহার পাস। ব্যাকুল আনন্দে তারই একখানা নিয়ে সে উপরে উঠছে—মনে পড়লো নিতাইয়ের কথা—আবার নেমে আরো বেশি কয়েকখানা নিয়ে উপরে উঠবে, কিন্তু এ কী! তার উপরে ওঠার সমস্ত চেষ্টাকে কে যেন ঠেসে ধরেছে। দম ফুরিয়ে যাচ্ছে তার—কতো চেষ্টা করছে সে সেই অজ্ঞাত হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে—এমন সময় তার ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ইয়াসিন পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ঠেলছে।

—কী রে শালা, তখন যে বড়ো উড়ে এসে আমার মোটটা নিয়ে গেলি?

ঘামে ভিজে গেছে শফিকের দেহ, ইয়াসিনের হাতটা সরিয়ে সে উঠে বস্ল; কিছু মতলব করে এসেছে নাকি ইয়াসিন?

—কীরে, জবাব দিচ্ছিস না যে?

হঠাৎ কোথা থেকে নিতাই এসে পড়ল—আরে তুই এখানে, আর

আমি ওদিকে সারা স্টেশন খুঁজে হয়রান! ঘুমোচ্ছিলি বুঝি?—বলেই সে ইয়াসিনের দিকে তাকাল—কী বলছে ও?

ইয়াসিন সরে পড়ল—আবার আমার ছোঁয়া মোট ধরবি তো দেখে নেব।

—কী রে, গায়ে হাত তুলেছে নাকি?—নিতাইয়ের চোখ জ্বলে উঠল।

—নাঃ। শাসাচ্ছে!

—আচ্ছা, আচ্ছা দেখিস্ তুই, এখন ভাগ!—তাড়া দিল নিতাই। শফিককে বললে—ঠিকেদারবাবুর বাড়ি যাবি?

—চল না যাইতো একবার।

কিন্তু তার কাছ থেকে ওরা হতাশ হয়ে ফিরে এল। বর্তমানে কুলির সংখ্যা বাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই, হলে সর্দারের সুপারিশ বিবেচনা করে দেখা যাবে। তাছাড়া তারাই বা এখানে থেকে পাশের কুলিদের অসুবিধে জন্মাচ্ছে কেন? কতোদিকে কতোকাজ পড়ে রয়েছে! অনেক রিপোর্ট তার কানে এসেছে। ভালোয় ভালোয় তারা সরে পড়ুক, নয়তো বাধ্য হয়ে তাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করবেন।

উলটো হুমকি! বিমর্ষ মনে ওরা ফিরে এল। এক যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া কোথায় আছে কাজ?

বেশি ভাববার সময় ছিল না; ভবানীগঞ্জ এসে পড়েছে। অজিত বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওরা ঘাটে গেল।

তারা বিশ্রাম কক্ষে এসে উঠলেন। অজিতবাবুর কাকা, এক পৌঢ়া বিধবা, অজিতবাবুর কাকীমা আর বছর দুয়েকের ছোট্ট একটি মেয়ে। প্রথম শ্রেণীর কক্ষ বন্ধ ছিল। চাপরাসীকে খবর দিতে সে সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল। তার ব্যবহারে বোঝা গেল,

সে অজিতবাবুর কাকার পূর্ব পরিচিত এবং তিনি নিঃসন্দেহে কোনো উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

মেল দেবে রাত দুটোয়। সুতরাং বিছানা-টিছানা খুলে একটু ভালো করে বিশ্রাম নিতে কোনো বাধা নেই! শফিক আর নিতাই তাদের বিছানা পেতে দিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে দূরে সরে দাঁড়াল। ছোট্ট ফুলের মতো মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে শফিক আর যেন চোখ ফেরাতে পারে না। এতো সুন্দর হয় শিশু! রোগা কাঠি কাঠি হাত পা অথচ পিলে পেট্টক, খ্যাংরার মতো চুল আর পিচুটি ময় ড্যাবডেবে চোখওয়ালা, ন্যাংটো, কিলবিলে সেই সব শিশুদের দেখে শফিক এতোদিন শুধু সভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ফুটন্ত পদ্মের মতো সুন্দর সুসজ্জিতা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। সারা ঘরময় সে ছুটে বেড়াচ্ছে—কখনো বা বাইরের বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে—মাকে ডেকে আধো আধো স্বরে বলছে কী সব কথা। সাবধান করে সরিয়ে আনতে গেলে ছুটে পালাচ্ছে আরেকদিকে। পরক্ষণেই রাস্তায় সাইকেল রিক্সার বেলের টুং টাং আওয়াজ শুনে রেলিং ধরে নিচে উঁকি দিয়ে পা নাচিয়ে হেসে উঠছে! শফিক মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইল।

পাখা নিয়ে বিশ্রাম-কক্ষের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে নিতাই বললে—কী ভীড় দেখেছিস! সবই বোধ হয় ঢাকা মেলের যাত্রী। খুলনা মেল আসামাত্রই অজিতবাবুদের তুলে দিতে হবে নইলে জায়গা পাবেন না।

—পূজো আর ঈদ এক সঙ্গে পড়েছে এবার। তার ওপর স্টিমার কমিয়ে দিয়েছে।

ঢাকা থেকে সেদিন আর কোনো স্টিমার এল না, রাত এগারোটায় এল খুলনা মেল। তার একটা মোট জুটল। খেয়ে শফিক বিশ্রাম কক্ষে এল।

—এই যে শফিক। নিতাই কোথায়, তুলে দেবে না আমাদের?

বিছানা বেঁধে ওরা সবাই প্রস্তুত হয়েছেন।

—এখন তো নয় বাবু,মেল কয়লাঘাট থেকে এলে তবে লোক উঠবে।

অজিতবাবু শান্ত হলেন। তার কাকা একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে চুরুট ফুঁকতে লাগলেন। তার স্ত্রী আর প্রৌঢ়া ওধারে শুয়ে পড়েছেন একটা সুজনি বিছিয়ে। খুকু, বিনু তাদের দুজনের মাঝে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। কে বলবে ও অতো চঞ্চল আর দুষ্টু।

—ভীড় হবে কেমন আজ?

অজিতবাবুর সঙ্গে এটা ওটা কথায় শফিক জমে গেল। বাইরের স্টেশনের কোলাহল তখন কিছুটা কমে গেছে। অন্ধকার বট গাছের তলায় নিভে এসেছে ফকিরের আগুন। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভীড় নেই। মাঝে মাঝে কানে আসে কারো কোনো উচ্চতর কথা, নিচের যাত্রিদের আলাপ-গুঞ্জন ছাপিয়ে। স্টিমারের ডাইনামো চলছে ঠক ঠক শব্দ তুলে।

এক সময় ঘড়িতে বারোটা শব্দ বেজে উঠল। এক নম্বর ঘাটে স্টিমার লাগার শব্দ পাওয়া গেল!

নিতাই ছুটে এল—স্টিমার দিয়েছে, তাড়াতাড়ি করুন বাবু।

ঘাটের ভীড় দেখে প্রৌঢ়া বিস্ময়োক্তি করে উঠলেন—এ ভীড় ঠেলে এগোবে কেমন করে?

নিতাই আগে এগিয়ে গেল—না পারলে বসেও যেতে পারবেন না। আমার পেছনে আসুন।

তৃতীয় কুলিসহ সবাই তার অনুসরণ করলে। অজিতবাবু আর শফিক রইল সবার পিছনে।

বিরাট জনতা ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের আগে ঢুকতে চাচ্ছে—কারো দিকে কারো কোনো দৃকপাত নেই।

—আস্তে আস্তে, সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে! করছেন কী মশাই!

অজিতবাবুর কাকা চাপের মধ্যে পড়ে ধমকে উঠলেন। কিন্তু চাপের কোনো পরিবর্তন ঘটল না। পুলের ওপর পা ফেলারও স্থান নেই। অবকাশ থাকে না। পিছনের চাপ সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। প্রৌঢ়ার পায়ে কার জুতোর চাপ পড়ল, তিনি অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন। কার সুটকেশ কোণার খোঁচায় আহত মাথায় হাত বুলোলেন অজিতবাবুর কাকা। মহিলাটি বিনুকে কোলে করে সামনে থাকার চেষ্টা করছেন। অজিতবাবুর কাকা পিছনে ফিরে তাকালেন, বেরিয়ে পিছিয়ে যাওয়ারও তখন উপায় নেই। যাত্রীজনতা যেন বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো উন্মাদ হয়ে গেছে। মাথার মোট সামলে রাখতে শফিকের গায়ে ঘাম ছেড়েছে। পাঁজরে করে কনুইয়ের ধাক্কায় রেলিংএর দিকে পড়তে পড়তে অতিকষ্টে সামলে নিল।

—আহা-হা—সম্মুখ থেকে একটা চিৎকার উঠল। বিনুর মা আর্তনাদ করে উঠেছেন। ঝুপ করে নিচের স্রোতমান জলে কী একটা শব্দ উঠল।

—কী, কী হোলো কাকিমা?—অজিতবাবু পাগলের মতো সামনে এগিয়ে গেলেন।

—বিনু পড়ে গেছে!

—বিনু পড়ে গেছে!—শফিক এক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে ছিল, তার পরে অজিতবাবু মোট দেখুন বলে ভিড়কে প্রায় পায়ে দলে সে বিনুর

মা'র কাছে এগিয়ে গেল—কোথায়, কোনখানে! ভিড়ের চাপ তখন কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছিল, তাদেরই কয়েকজন আঙ্গুল দিয়ে স্থানটা দেখিয়ে দিল। বিনুর মা নিথর। ফ্যাল ফ্যাল করে জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—কেমন করে ধরেছিলে তুমি?—ক্ষিপ্ত ক্ষোভে বিকৃত শোনাল বিনুর বাবার স্বর।

প্রৌঢ়া বিলাপে মুখর। শফিক কালবিলম্ব না করে জলে লাফিয়ে পড়ল।

জোয়ারের স্রোত ফ্লাট আর স্টিমারে বাধা পেয়ে ঘূর্ণী রচেছে সে স্থানটাতে। স্বল্পজ্যোৎস্নায় চোখে পড়ে শুধু কালো জল। ছুটন্ত কলকল ছলছল ধ্বনি এবার সমস্ত যাত্রীদের কোলাহল ছাপিয়ে কতোগুলি ব্যগ্র মুহূর্ত নিয়ে এল। এক-দুই—পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল। সেই যে শফিক ডুব দিয়েছে আর জাগছে না। গোটা কয়েক টর্চের আলো কালো জলের ওপর সন্ধানে লাগল। ঐ বুঝি ভেসে উঠল কোন মাথা ফ্লাটের আড়ালে বা নোঙর দেওয়া শেকলের গোড়ায়। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ করে ছুটে যাচ্ছে অথৈ জল কালো কালো কচুরীপানা ঘোরাতে ঘোরাতে।

আর উঠতে হবে না। ফ্লাটের নিচে আটকে গেছে নিশ্চয়। গতোবার এমনি করে মরল না একজন!

এখনো উঠছে না দেখে সন্দেহ হয়।

যাত্রীদের মাঝ থেকে নানা কণ্ঠ মন্তব্য করে।

এমন সময় পাড়ের দিক থেকে রব উঠল—উঠেছে! পেয়েছে!

টর্চের আলোগুলো বিদ্যুৎবেগে সেদিকপানে ঘুরে গেল: খাড়া পাড় বেয়ে উঠে আসার শক্তি পাচ্ছে না শফিক। তার কোলে সংজ্ঞাহারা বিনু। বিনুর মা উল্লাসে চিৎকার করে ছুটে গেলেন।

স্টিমার কোম্পানীর জনৈক সাহেব দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। অচৈতন্য শফিক জ্ঞান পেয়ে দেখল, তিনি তার সামনে উবু হয়ে বসে আছেন। সে সসম্ভ্রমে উঠে বসার চেষ্টা করতেই তিনি ওর ঠোঁটের কাছে একটা ছোট গ্লাস তুলে ধরলেন—এইটুকু খেয়ে ফেল।

কতোকটা ভয়ে ভয়েই শফিক যেন সে পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করল। তাকাল নিজের চতুর্দিকে। সাহেবের পেছনে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সর্দার। শিয়রের কাছে বসে আছেন স্নেহময় চোখে অজিতবাবুর কাকা। নিতাই, গফুর, ইয়াসিন এবং আরো অনেকে নন্দিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শফিক কেমন সংকুচিত মনে করল নিজেকে। অতো দূরে সরে দাঁড়িয়েছে কেন ওরা? চুপিচুপি ডাকলে—নিতাই!

কীরে, সুস্থবোধ করছিস এখন?

বিন্নু কোথায় রে?

তার মায়ের কাছে। ভালো আছে। সবাই কী যে সুখ্যাতি করছে তোর।—উৎসাহের আবেগে শফিকের হাতখানা সে চেপে ধরে।

সাহেব আর বিন্নুর বাবা কী কথা বলছেন। শফিক আবার শুধাল—মোটগুলো ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, বিছানাও পেতে দিয়েছি। তুই এক কাজ কর, বাবুর সঙ্গে সাহেবের চেনা আছে, এই সুযোগে কথাটা পেড়ে দেখ। সাহেব বাবুর কাছে তোর সাংঘাতিক সুখ্যাতি করছেন রে!

বলবে কী বলবে না, দেখতে লাগল শফিক। জাহাজঘাটের পাস পাওয়া কুলি এবার সে হবেই। ভিখিরি বলে ভানু আর অবজ্ঞা করতে পারবে না। এবার সাহেবের কানে তার নিবেদনটা পৌঁছুলে

তাকে যে নিরাশ হতে হবে না—তাতে সে নিশ্চিত। কিন্তু পাস পেলেও সে খুশি হবে কী? ঐ নিতাই, ইয়াসিন—ওদের কাছথেকে সে যাবে দূরে সরে। ইয়াসিন হোক তার প্রতি বিরূপ বা তার স্বভাব খারাপ, কিন্তু সেতো জানে কত কষ্ট করে আজ পর্যন্ত সে তার বুড়ি মাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একলা পাস পেলে সত্যিই কী সে আনন্দ পাবে? তার চাইতে ওদের কথাও সাহেবের কাছে বললে কেমন হয়? সাহেব মানুষ ওরা, ইচ্ছে করলে সব ছন্নছাড়াদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

# কেরায়া নায়ের মাঝি

বিলের ফুরফুরে বাতাসে অতি ভোরেই জমিলার ঘুম ভাঙল। শিয়রের দিকে দুয়ারটা খোলা। দুই ছেলে আর শিশু মেয়ে তখনো ঘুমন্ত, শুধু আজাহার বিছানায় নেই—পুরু কাঁথাটা পায়ের কাছে সরিয়ে দিয়ে কখন উঠে গেছে! গত সপ্তাহখানিক ধরে আমাশয় ভোগা কাহিল শরীরে সে বিছানা ছেড়েই উঠতে অক্ষম, তবু এই এতো ভোরে কোথায় বেরিয়ে গেল?—এদিক ওদিক, সম্ভাব্য স্থানে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বিস্ময়বিমূঢ়া মনে সে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল।

ঘাটে নৌকাখানাও নেই। জমিলা যেন হঠাৎ আঘাত পেয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ল। ঐ শরীরে আজাহার তাকে না জানিয়েই কেরায়া বাইতে বেরিয়ে গেল? হতে পারে, ভাঙা ঝুরু ঝুরু সংসারের অভাব অনটন নিয়ে কাল তার সঙ্গে খিটিমিটি করেছিল বা অনেক যা-তা কথা বলেছিল (তখন কী মেজাজ ঠিক ছিল জমিলার!) তবু সুস্থ হলে কথা ছিল না, কিন্তু এমন অসুখ-কাঁপা স্বাস্থ্যেও সে বেরিয়ে যায় কেমন করে?

খালের ঘাটে মুখ ধুতে বসে গত বিকেলের ঘটনাটা একবার পর্যালোচনা করে এল জমিলা। ছোটছেলে কাসেম কাল মুন্সীবাড়ির দিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল; জমিলা প্রশ্ন করে জানে তাদের কাছারীর সামনে শসার মাচা থেকে সে একটা ছোট শশা ছিঁড়েছে দেখে, ছোটমিয়া তার গালে চুরির অভিযোগে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে। সে কী চড়! পাচ পাঁচটা আঙুল রক্তশূন্য

হলদে গালে কালো হয়ে ফুটে উঠেছিল! সামান্য একটা কচি-শশার এই মূল্যাধিক্য জমিলাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তোলে; এমন গালাগাল ছিল না যা সে নেপথ্যবাসী ছোটমিয়ার উদ্দেশে পাড়েনি! আজাহার হৈ হৈ করে ধমক দিয়ে ওঠে—ওরে চুপ, চুপ হারামজাদী, হেরা হোনলে আর রক্ষা থাকপে না। হপ্তায় হপ্তায় মুন্সীবাড়ির কেরায়াডা পাই দেইখ্যাই মাঝে মাঝে খাওনডা জোডে—হেয়া মনে রাহিস।

—বাও ক্যা অমন চাড়ালের কেরায়া? তুন্ইয়াইতে আর চড়নদার নাই? বড়ো আষ্টো আনা এক টাহা দে হেইর পানহে একবারে কেনা গোলাম অইয়া থাকমু। ক্যা তুন্ইয়াইতে আর মানু নাই?

—থাকলে দেহোনা! বিনা ওষুধে পথ্যে পড়ইয়া রইছি, জিগাইতে আইছে কেউ, বোলে,—ম্যাভাই কী অইছে তোমার—? বলতে বলতে আজাহারের ঠোঁট তুটি কেঁপে উঠেছিল।

কিন্তু জমিলার তখন মত্ত মেজাজ, বলেছে—তুমি চোপো, তোমার নাহান অতো ভিজা বিলই আমি না যে, এতো' অন্যায় সইয়াও চুপ করইয়া থাকমু। আমার পোলারা চোর একথা কইবে কেউ? খিদার চোডে এউক্কা শসাই যদি নিয়া থাহে হেতে—, আমি ভিজা বিলই?—আজাহার তার খিট খিটে মেজাজ সত্ত্বেও নিজেকে সংবরণ করেছে। ছেলেমানুষের মতো অভিমান আর বদমেজাজীর উষ্মা তুই-ই তাতে মেশানো।··· সে মুহূর্তটি মনে পড়লে জমিলার এখনো হাসি পায়, অথচ এরি জবাবে সে বলে ফেলল—ভিজা বিলই না? পোলাগো খাওয়াইতে পারবা না, হেরা এরডা ওয়ডা যাইয়া ধরবে, এর তুয়ারে চাইবে ফ্যান, ওর তুয়ারে ক্ষুদ—কেউ কিছু না দেলে খাওনইয়া জিনিস পাইলে খাইবে, আবার হেইয়ার উপরে যদি খায় অন্যায় মাইর, তউ তুমি কিছু কইতে পারবা না?

—না পারমু না। গেছেলে ক্যা রাক্ষুসইয়া হেয়ানে?

—রাক্ষুসইয়া! কয়দিন ধইর‍্যা পেটে ভাত পড়ে না খেয়াল আছে? হ্যাহো, তোমার ব্যারামইয়া শরীল, তুমি বাজে প্যাচাল পুইতোনা। খিদায় যদি একটা কচি হোয়া ছিড়ইয়াই খাছে, হেতে এমন অন্যায়ডা কী অইছে হুনি? মুন্সিগো দৌলত হের জন্যে কতোহানি কমছে?

—হেরা শখ কইর‍্যা লাগাইছে।—না কইয়া ও ছেড়তে গেলো ক্যান?

—জানি জানি, হেগো চিত্তডা কেমন জানি! এউক্কা শশার লইগ্যা বাছারে আমার এমন চোপাড় দেছে, যে ভিরমী খাইয়া পড়লে, বড়োগ্যাদা কোলে কইর‍্যা কাঁদতে কাঁদতে দুইট্যা আইছে—

চড় খেয়ে ছেলেটা ভারি নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ক্ষুধায় পেটে-পিটে এক, চোখ দুটো কোটরাগত—তার ওপর চড়ের ধাক্কায় সে সেখানেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

—বেশ করছে, গেছেলে ক্যা হারাম জাদা?

—তউ তুমি কবা গ্যাছেলে ক্যা? কিছু কইতে পারবা না, খাইতেও দেতে পারবা না, তয় জন্ম দেছেলা ক্যা?

এর পর আজাহার আর একটি কথাও উচ্চারণ করেনি, অকস্মাৎ চুপ করে গেছে। তারপর গভীর রাত্রে জমিলা ঘুম ভেঙে দেখে কাসেমের আহত গালে বীতনিদ্র আজাহার শুয়ে শুয়ে হাত বুলোচ্ছে।—খুউব খিদা লাখছেলে তোর, না?

—হুঁউ।

খালের ওমুখে একটা অগ্রসরমান নৌকো দেখা যেতেই জমিলা

পাড়ে উঠে এল; নৌকাখানা করিম মাঝির। তার বাড়িও এই গ্রামে, আজাহারের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। যেতে যেতে সে জমিলাকে দেখে প্রশ্ন করল—আজাহার আছে কেমন ভাবিছাব?

ঘোমটা টানার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি জবাব দিল জমিলা—অসুক হেই রহমই, তউ আইজ্ঞ আবার কেরায়ায় গেছে। কিছু কইয়াও যায় নায়,—আপনে হেরে দেখলে যেভাবে পারেন বাড়ি পাঠাইয়া দিয়েন!—

—কেরায়ায় বাইর অইছে!—করিম বৈঠা থামিয়ে বিস্ময়ধ্বনি করল—ও শরীলে যাইতে দেলা ক্যামনতারা?

—কই যে, রাইতে না জানাইয়া গেছে!

—ওঃ আচ্ছা—কাইল ফিরমু আমি—এয়ার মধ্যে দেহা অইলে অবশ্যই পাঠাইয়া দিমু।

করিম চলে যেতে আবার ঘাটে নামল জমিলা। ওপাড়ের ঘাটে সেই সময়ে মুখ ধুতে এল সালেহা।

—জানো সালেহা হাসেকের বাপে আইজ ব্যানে রাগ অইয়া নাও লইয়া বাইর অইছে।

—রাগ অইয়া! ক্যা, ঝগড়া হরছিলি বুঝি?

সংক্ষেপে ঘটনাটি জানাল জমিলা। সালেহা হেসে উঠল—ভিজা বিলই কইলে রাগ অইবে না? সুস্থ মর্দ হোসলেও তো চ্যাতে। তায়, একে হে ব্যারামইয়া, হেয়ার উপরে তোর আদরের—তার সহাস্য মন্তব্যে জমিলা ধমক দিয়ে উঠল—দূর মুখপুড়ী, দিন দিন তোর বয়স কমে না বাড়ে?

সালেহা হাসতে হাসতে পাড়ে উঠে গেল কুলি ছিটিয়ে—যেতে

যেতে বলে গেল—ভাবিস না, দেহিস আনে হাঁঝের আগেই আবার কোলে ফিরইয়া আইচে!

—ধ্যেৎ!—তামাসা উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা জমিলার নেই। ছেলেরা নাচনমহল হাটে শাপলা বিক্রী করতে যাবে বলে ডাকাডাকি শুরু করেছিল; জমিলা ঘাট থেকে উঠে এল।

দুটি ছেলে হাসেম আর কাসেম, শাপলা নিয়ে হাটে রওনা হোলো। ছোটো মেয়ের ঘুম ভেঙেছে; তাকে মাই দিয়ে ঠাণ্ডা করে, তার নষ্টকরা কাঁথা কাপড় ধুয়ে, স্নান করে আবার দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসার সময় জমিলা লক্ষ্য করল সূর্য এরই মধ্যে মাথার উপর উঠে এসেছে। ক্ষুধা লেগেছে তার, কিন্তু ঘরে খাবার নেই কিছুই। কালকের কোথা থেকে আনা একটা নারকেলের অর্ধেকটা ছেলেরা খেয়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটা শিকেয় ঝুলছে, হয়তো ওরা ফিরে এসে খাবে। জমিলা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সেটা নামিয়ে এনে কামড়ে কামড়ে খেল খানিকটা। হাওয়ায় একটা কেমন গুমোট শুকনো ভাব। সারা গায়ে ঘাম ছেড়েছে। জমিলা একটা পাটি বিছিয়ে দক্ষিণের দুয়ারটার কাছে শুয়ে পড়ে। চোখে পড়ে বিলের বুক চিরে জেলাবোর্ডের নতুন গড়া পথ—সোজা চামটা হাট পর্যন্ত চলে গেছে। ছাতা মাথায় একটি লোক সেদিকে যাচ্ছে, রোদে ঝিলমিল করছে তার দেহ। রাস্তায় চামটা হাটের দূরত্ব চার মাইল অথচ আগে এই নদীনালা খালবিলের দেশে সেখানে যেতে সকাল সন্ধ্যা লাগতো। বিয়ের দুবছর পরে আজাহারের সাথে সে একদিন জারীগান শুনতে চামটা গিয়েছিল। আঁকা বাঁকা খালবিলের পথটা ভারি ভালো লেগেছিল! তখন—হ্যাঁ আশ্বিন মাসই—সকালে রাঁধা-ভাত নিয়ে তারা রওনা হোলো। সে ছিল ছইয়ের মধ্যে বসা; সামনে পর্দা টাঙানো। আজাহার

গলুইতে বৈঠা হাতে বসে নির্দেশ দিয়েছে শান্ত শিষ্ট কলাবউয়ের মতো বসে থাকতে। জমিলা বহুবার উসখুস করল চারিদিকের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বলে ; কিন্তু আজাহারের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে লোকালয় একটু পাতলা হতেই সে একটানে পর্দাটা খুলে ফেলল।

—বাবারে বাবা, আমি কী একটা মানু্ না! কোন হান দিয়া আইলাম গেলাম হেয়া দেখমু না, তয় আইলাম ক্যা ?

আজাহারতো হা-হা করে উঠেছে—আহা-হা, করো কী, করো কী, ব্যাডারা আছে।

—আছে হেতে কী অইবে? খাইয়া তো হালাইবে না কেউ! —বলতে বলতে সে ছইয়ের বাইরে গিয়ে বসেছিল, তারপর চারদিক দেকে বললে—সবদিকে বিল, এয়ার মধ্যে তোমার বউরে কেউ দেখতে আইবে না।

আজাহার হেসে চুপ করে থেকেছে। ঐ বিলের মাঝামাঝি তারা পৌছেচে, যেখানে ঐ ছাতামাথায় লোকটি দেখা যাচ্ছে, প্রায় অমনি জায়গায়—আজাহার পিছনে আঙুল দিয়ে নিজেদের বাড়িটা দেখিয়ে দিল তখন। সবুজ গাছপালা ঘেরা তাদের বাড়িটা বিলের পাশে দাঁড়ানো ; ঘর-টর কিছু চোখে পড়েনি। কী না বিচিত্র মধুর ছিল সে দিনের স্বাদ! বিলের স্বচ্ছ জলের বুক ঠেলে ওঠা ধানের গোছা, শাপলার পাতা, ফুল আর ফুল; হাত দিয়ে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল সব। রাঙা ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় পড়ল একটা, অহেতুক ভাবে একটা পুঁটি লাফিয়ে উঠল নৌকায়। গাঙ শালিখের 'হট্টিট্টি' চিৎকার শুনে সে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল বারবার, আজাহার তো তার চাঞ্চল্যে অস্থির—ছইর মধ্যে যাইয়া বও, ওরহম করলে পড়ইয়া যাবা ; আর, না হয়, আমারে এট্টু তামাক খাওয়াও। আজাহারের ঘর্মাক্ত

পেশীগুলো বৈঠার টানে ফুলে ফুলে উঠছে ; চোখ মুখ সব রোদে লাল। তামাক খেয়ে আবার বৈঠা হাতে নেবার সময় জমিলা বলেছিল, এটু জিরাইয়া লও এবার—

আজাহার তা শোনেনি ; জমিলাই তাকে জোর করে ছইর মধ্যে টেনে আনল, তাকে শুইয়ে ঘাম মুছিয়ে দিল যত্ন করে। সেই সময়ে খোঁপার শাপলা ফুলটা পড়ে গিয়েছিল আজাহারের মুখের ওপর। সেটা তুলে আবার খোঁপায় পরার সময় জমিলা বললে—তোমার মুখখানো রৌদে এই ফুলডার নাহান রাঙা অইয়া ওঠছে।

বলেই পড়ল বিপদে ; আজাহার উঠে দুষ্টুমি শুরু করে দিলে—হাচইও ? আমারে হেইলে কোন হানে লবা ?

এবং উত্তরের কোনো প্রতীক্ষা না করেই আজাহার তার কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে ; জমিলা তো লজ্জায় কী করবে ভেবে পায় না।—ছিঃ, ঐ দেহো ব্যাডারা !

ধমকে কাজ হোলো, আজাহার তাড়াতাড়ি আবার বৈঠাহাতে গলুইতে গিয়ে বসে—কই ব্যাডারা ?

সামনে ফের পর্দা টানিয়ে জমিলার সে কী উচ্ছ্বসিত হাসি ! বাওনা তরাতরি, হাঁঝের আগে পৌছবা কেমনে ?

সেই মাদকতাময় দিনগুলি কোথায় গেল ? ছেলেমানুষের মতো আজাহার, সে সেদিন পর্যন্ত কেরায়া বাইতে যাবার আগে জমিলার পানরাঙা ঠোঁটের চুমু না খেয়ে বেরোতো না—তাকে কেন যে কাল অমন শক্ত কথাটা বলতে গেল ? সে কী তাদের খাওয়া পরার চেষ্টার কসুর করে ? ধুলোট কৃষির সময় সকাল সন্ধ্যা খাটুনি, একা একা জোঁকের কামড় খেয়ে বর্ষা ক্ষেতে বীজ বুনোনো, চাই বুনে মাছ ধরা, হাটে বিক্রী করা, তার পরেও অবিরাম 'কেরায়া' বাওয়া—

কতো আর করবে একলা মানুষ? জমিলার চাইতে সে কী ছেলে মেয়েদের কম ভালোবাসে? কাসেমের গেলবার জ্বরের সময় সারারাত নির্ঘুম চোখে তার মাথায় হাত বুলোয়নি সে? একদিন অবস্থা একটু খারাপ হোলো, কাসেম কথা বলে না, বুকের মাঝে কেমন একটা অশুভ ঘড়ঘড় শব্দ, মুখে উঠল ফেনা। আজাহার কী কম কেঁদেছে সেদিন!

অনুতাপের আর অবধি রইল না জমিলার, অল্প অসুক নয়, রক্ত আমাশয় শরীর শুকিয়ে এমন হয়েছে যে গায়ে আধ পয়সার বল নেই; উঠতে গেলে কেঁপে বসে পড়ে, সেই আজাহার কেমন করে আজ নৌকো নিয়ে বেরিয়ে গেল। গেছে যে জমিলার কথার উপর রাগ করেই তাতে আর কোনো ভুল নেই, কিন্তু জমিলাকে কী সে চেনে না, মুখ ফসকে যে কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, বাস্তবিকই সেগুলো কী তার অন্তরের কথা? রাগ করে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই, নইলে কী যাবার আগে জানিয়েও যেতে পারত না তাকে!

বেলা পড়ে এসেছে। পাখি-পাখালির ডাকে আর নিভন্ত আকাশে বিকালের ঘোষণা। রাস্তার ওপর গোরু নিয়ে ফিরছে কয়েকজন লোক; খালে কাদের নৌকো যাওয়ার শব্দ। মেয়ে জেগে উঠে মাই হাতড়ে কাঁদতে শুরু করেছে, তবু জমিলার আচ্ছন্নতা কাটে না—যেন সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে—ঐ দূর বিলপ্রান্তের ঝিলমিলে গাছপালার অন্তরালে। বালিশ ভিজে উঠছে তার অনুতাপের অশ্রুতে।

শেষে ছেলেরা এসে পড়তেই সে উঠে পড়ে। বড়ো ছেলের হাতে চালের বড় পোঁটলা, সেটা দাওয়ায় নামাতেই ছোটো ছেলে ভেতর থেকে কি একটা মোড়ক তুলে নিলে; বড়ো ছেলে হা হা করে উঠল—

—দে, দে—আমাড্ডে দে, হালাইয়া দিবি তুই।—থাবা দিয়ে জিনিসটা সে নিজের হাতে নিল—বাজানে আইছে মা?

—না। ক্যা,—তোর হাতে ওডা কী?

—অষুধ। হাটখোলার অশ্বিনী কবিরাজের হাত পাও ধরইয়া এড্ডু আনছি বাজানের লইগ্যা। দেতে কী চায়! হ্যাশে—

ছোটোছেলে বলে উঠল—এয়া খাওয়াইলেই আমাশা ভালো অয় হে কইছে!

দিগ্বিজয় করে এসেছে যেন দুভাই। পথকষ্টে দেহ শ্রান্ত, কিন্তু এই ওষুধটুকুর জন্যই তাদের সারা অন্তর উৎসাহ আর আনন্দে প্রদীপ্ত।

—যা মাচার উপরে থুইয়া আয়।—এতে চাউল কয় সের?

—এক সের। তুমি মা রান্ধো তরাতরি, খিদা লাগছে—বলেই ছোটছেলে নেতিয়ে শুয়ে পড়ে। জমিলা তাড়াতাড়ি রান্না বসাতে যায়।

খাওয়া দাওয়া মোছা সারা হতেই বিকেল প্রায় শূন্য হয়ে আসে। দূরের অথৈ বিলের জল তীক্ষ্ণভাবে ঝলমলায়; কাঁঠাল-আমের আড়ালে ঢাকা সূর্য—পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ ছায়ার চঞ্চলতা রচনা করে বিস্তৃত উঠোনে। গাছে গাছে পাখি-পাখালির হিসাবনিকাশ, নীল আকাশের গায়ে সারবাঁধা বকের অভিযান আর গাঙ শালিখের কচিৎ সরবতা যেন কলরব করে জাগায় সন্ধ্যার আগমনী। তখনো আজাহারের কোনো সংবাদ নেই।

সন্ধ্যাও পার হয়ে গভীর রাতে সারাদেশ নিথর হয়ে আসে; জমিলার চোখে ঘুম নেই। খাল পাড়ে বা বাইরে সামান্য একটু শব্দ হলেও সে চমকে উঠছে—ঐ বুঝি এল। চকিতে বিছানা ছেড়ে

দাওয়ায় নেমে সেদিকে কিছু দেখতেও চেষ্টা করে, কিন্তু কখনো সেদিককার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর নীরবতা ভেঙে আজাহারের লম্বা শীর্ণ দেহাবয়ব বেরিয়ে আসছে দেখা যায় না। জমিলা আবার বিছানায় এসে বসে। রাত বাড়ে, ক্ষীণ একটু চাঁদ আকাশের ওপাশ থেকে যাত্রা শুরু করে।

বিলের বুক থেকে একটা ঘুম পাড়ানো হাওয়া অনেক পাতা ঝড়ার শব্দ তুলে বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যায়; পরিষ্কার শোনে জমিলা খালপাড়ে কার নৌকার শিকলের শব্দ। তাড়াতাড়ি সে দাওয়ায় নামে; ঘরে এককোঁটা তেল নেই যে কুপিটা জ্বালবে। আবছা আলোয় খালপাড়ে যাবার সংকীর্ণ পথটুকু দেখা গেলেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে জমিলা সেপথে কাউকে দেখে না। ভাবে, হয়তো এখনো রাগ পড়েনি আজাহারের। তার ছেলেমানুষী অভিমান, তাকেই সাধাসাধি করে ভাঙাতে হবে। সে জন্যই সে নৌকো ছেড়ে উঠছে না হয়তো। দাওয়া থেকে নেমে সে খালপাড়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু কোথায় নৌকো। স্রোতোমান খালে ওপরের গাছের পাতার ফাঁকে ঝিলিমিলি চাঁদের ছায়া যতোটুকু স্থান স্পষ্ট করে তুলেছে—তার কোনোখানেই কোনো নৌকোর চিহ্ন নেই। ভাঙামনে সে আম গাছটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। মাথাটা যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে তার, মনে হচ্ছে হয়তো বা সে ঘুরেই পড়ে যাবে।

দূর বিলের ওধারের জঙ্গলে কতোগুলি নিশাচর পাখি ডাকে, সারা বাতাস অবাধে তাদের কলরব ছড়ায়; সালেহাদের বাড়ির বাদামগাছে অজস্র বাদুড় ডানা ঝটপটায়ঃ আসে পাশে কোথাও ডাকে ডাহুক। কেমন একটা ব্যাকুল শূন্যতায় জমিলা অস্থির হয়ে ওঠে। বিলের ওপারের জঙ্গলে একপাল শেয়াল ডেকে ওঠে,

সরসর করে কি একটা চলে যায় নিচে কেয়াবনের ঝোপে— গা ছমছম করে ওঠে জমিলার। আস্তে আস্তে ঘরে চলে আসে।

ভোরে বড়ো ছেলেকে পাঠিয়ে দিল নলছিটি হাটে; আজাহার হয়তো বা গেছে গঞ্জের ঘাটে। কিন্তু সেখানেও নাকি সে নেই, ঘাটমাঝিও কোনো খবর জানে না তার।

সেদিনের দুপুর গড়িয়ে গেল তখন পর্যন্ত ফিরে এল না, না-পাওয়া গেল তার কোনো খবর। জমিলার উদ্বেগ—বিরক্তি আর রাগের রূপ নিল এবার। এতো রাগও করে মানুষ!

দেহ একে ক্ষুধায় নির্জীব, তার ওপর আজাহারের জন্য এই দুশ্চিন্তা, জমিলা সত্যি সত্যি খুব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আজাহারের ওপর; তবু খালের দিকে চেয়ে একটা ছায়াশীতল গাব গাছের তলায় সে বসে রইল। কিন্তু কোথায় কে!

সহসা একসময় তার সারা গা শির শির করে উঠল দুনিরিধ্য শীতে। বুঝতে পারে জমিলা সারা গা কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে তার। আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেবার সাধ্যও যেন তার নেই। হাতে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে সে আর একবার তাকাল খালের প্রান্তে—এবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই হবে তাকে। হায় খোদা! আজাহারকে তুমি এনে দাও, আমি তার পায়ে ধরে মাপ চাইব। তার অভিমানী মন আঘাত পায় এমন কথা আর কোনোদিন বলব না।

কিন্তু সে পরিচিত নৌকোখানা বিপরীত দিক দিয়ে কখন যে এতো কাছে এসে পড়েছে, জমিলা সহসা তা দেখেনি। দেখতেই তার সারা শরীরে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। খোদা শুনেছে তার প্রার্থনা।

কিন্তু ওকী? তাদের নৌকো করিম মাঝি বাইছে কেন, আর নৌকোর মাঝে থরে থরে সাজানো ভালো ভালো সওদা কিন্তু ওপাশে শোয়া রয়েছে কে? আজাহারের অসুখ কি তাহলে খুবই বেড়েছে! কিন্তু অমন বিদ্‌ঘুটে ভাবেই বা সে শোয়ানো রয়েছে কেন? করিম মাঝি চোখ ফিরিয়ে লুকোতে চাইছে কী?

করিম মাঝি কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগে নৌকাটা বাঁধল পরে নত মুখে বললে—আর কী জিগাও ভাবিছাব, ম্যাভাই আর নাই। চাঙটা যাইয়া দেখি অর্ধেক সাজানইয়া কলকি হাতে নায়ের মধ্যে মরইয়া পড়ইয়া রইছে—

জমিলার আর্তনাদে ওবাড়ির সালেহাও অপর পাড়ে দৌড়ে এল। ছোটো ছেলেটা উঁকি দিয়ে বাবার নৌকো দেখেই আবার ঘরে ছুটল—ওষুধটা দিয়ে তার বাবাকে খুশি করে দেবে অন্য ভাইয়ের আগে।

জমিলা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে আবার থেমে গিয়েছিল। রাগ করেনি আজাহার, পিতৃত্বের কর্তব্য করেছে তার—জনকের দায়িত্ব। তার মৃতদেহের আশে পাশেই রয়েছে চাল, ডাল এবং আরো নানা সওদা। আর আশ্চর্য—চালের সাজিটার উপর কচি কচি দুটি শশাও!

# পৌষ

এই পৌষের প্রতীক্ষায় তাজু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

চাষী জীবনের সেরা সময় পৌষমাস; বুকে আসে অনেক শ্বাস, পায় অনেক আশাপূরণের আশ্বাস। কিন্তু সেসব মিথ্যা হইয়া যাইতেও সময় লাগে না। তাহার বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

কার্তিক হইতে তাজু তাহার সর্বাপেক্ষা আগে বোনা জমিখানার আশে পাশে ঘুরিয়া সবুজ চারাকে রঙ বদলাইয়া কুঁড়িময় হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে; কখনো বা আলগোছে দুই একটি ধান ছিঁড়িয়া পাকিল কিনা পরীক্ষা করিয়াছে; পাশে বসিয়া কল্পনায় বুনিয়াছে মন্বন্তরোত্তর জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নজাল। অবশেষে তাহার দীর্ঘপ্রতীক্ষার অবসান করিয়া সেই ধান পাকিয়াছে। দুর্ভিক্ষের বৎসর হইতে দিনগুলি দুঃস্বপ্নময় রাত্রিপ্রহরের মতো কাটিতেছে, তবু, পাঁচকুড়া জমির সোনালি ভারে অবনত গুচ্ছগুলির দিকে চাহিয়া তাহার বিষণ্ণ বুক কী এক আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। এই ধানে দুর্দিনের খাওয়া-পরা কতোদিন চলিবে, সেসব দুর্ভাবনায় আপাতত মন ভারাক্রান্ত না করিয়া, কতোগুলি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সে এককুড়া জমির ধান কাটিয়া ঘরে আনিয়াছিল। কিন্তু সেই ধান মাড়াই করিয়া, মাপিয়া, পরিমাণ দেখিয়া তাহার সারা মনে দুশ্চিন্তা ছাইয়া আসিল—এইরকম ফসলে দুঃখরাত্রি কাটাইয়া উঠিবার আশা কোথায়?

গ্রামের সমবায় কৃষিঋণ সমিতির কর্জ টাকায় মা-ছেলে এতোদিন ফ্যান-ভাত খাইয়া কাটাইয়া আসিয়াছে। সে টাকা শোধ দিতেই হইবে,

তাহা ছাড়া গত কার্তিকে হলধর চক্রবর্তীর নিকট হইতে তিরিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, গত পৌষে তাহার বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও তাহা শোধ করিতে পারে নাই ; এবারও এই ধান উঠিবার বহু পূর্ব হইতেই তিনি স্থদে আসলে চল্লিশটি টাকার কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া আসিতেছেন ; তাহার সে টাকা শোধ না করিয়া উপায় নাই। নহিলে, যে-মানুষ হলধর চক্রবর্তী, কোনদিক দিয়া কোন প্যাচ কষিয়া অধিকতর এক বিপদে ফেলিবে, তাহা ভালো করিয়া খেয়ালও করিতে পারিবে না। অথচ এদিকে কাপড় জামারও দরকার—বিশেষ করিয়া যাহার জন্যই তাহার ধান পাকিবার তর সহিতেছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া কি করিবে ভাবিয়া তাজু দিশাহারা হইয়া গেল। মাপা ধানের সাজিগুলি ঘরে তুলিয়া রাখিয়া সে চাচার ঘরের চুলাশালে গিয়া বসিল।

তাহার মা, চাচী এবং তাহার দুই মেয়ে রিজিয়া ও সেতারা, তখন রোজকার মতো উনুন ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। উনুনে ধানের হাঁড়ি ; মুখের কাছে বসিয়া চাচী মাঝে মাঝে কুটা ঠেলিয়া দিতেছেন। আগুনের লালচে আভায় অন্ধকারে সকলের মুখ মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

তাজু কিছু কুটা টানিয়া একপাশে বসিয়া খানিকক্ষণ তাহাদের গল্প শুনিল। মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল—মাত্র কাপড়ের ছেঁড়া খুঁটখানা দিয়া তিনি বসিয়া গল্প শুনিতেছেন।

—এখনো ঘুমোতে যাওনি তুমি? যা শীত! আমাদের হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে—আর তুমি—ওঠো, ওঠো, ঠাণ্ডা লেগে শেষটায় অসুখে পড়বে।—একরকম জোর করিয়াই তাজু তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিল।

রিজিয়া কৃত্রিম কোপকণ্ঠে কহিল—মায়ের জন্য এতো দরদ একটা কোর্তা কিনে দিলেই পারো ?

—পারলুম কই এতদিন, এবার দেবোই দেখো। তোমার গায়ের ঐ কোর্তার চাইতেও সুন্দর কোর্তা আনবো।

তাহার কৌতুককণ্ঠ শুনিয়া চাচীর মুখে হাসি দেখা দিল। রিজিয়া অপ্রস্তুত মুখে কহিল—আমার কোর্তাটা আবার সুন্দর নাকি ? বলিয়া মায়ের দিকে ফিরিয়া তাড়া দিল—বলো না মা আর একটা গল্প।

তাজু টের পাইল—অসন্তুষ্ট হইয়াছে রিজিয়া; সেতারাও তাহার পায়ে চিমটি কাটিয়া সেই ইঙ্গিত করিল। ফুল আঁকা ঐ কোর্তাটির জন্য রিজিয়ার গর্বের অন্ত নাই। সখ করিয়া কিনাইয়াছে। খানিকক্ষণ তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাজু হাসিয়া উঠিল—রাগ করলে রিজিয়া ? পাগল ! তোমার ও কোর্তাটিকে খারাপ বলি নাই। সত্যিই তোমার গায়ে ওটি চমৎকার মানাইয়াছে। একথায় রিজিয়া যে আবার খুশি হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার বাঁকা কটাক্ষেই তাজু বুঝিতে পারিল। সেতারা ছেলেমানুষ। সেও এবার প্রত্যাশী মুখে জিজ্ঞাসা করিল আর আমার কোর্তাটি ?

কিন্তু তাজু এক ফুৎকারে তাহার সব উৎসাহ যেন নির্বাপিত করিয়া দিল—দূর রিজিয়ারটি কতো সুন্দর ?

সেতারা চটিয়া গেল, হুঁ ববুর কোর্তাটিকে তুমি তো ভালো বলবেই ! তাহার কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া চাচীর সামনে তাজু রিজিয়া দুইজনেই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রিজিয়া দুম করিয়া তাহার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল। ফাজ্‌লামি হচ্ছে !

তাজু মুখ নিচু করিয়া আড়চোখে চাচীর দিকে তাকাইল একবার।

তাহার ও রিজিয়ার বিবাহের কথাবার্তা বহুদিন হইতেই একরকম স্থির! কিন্তু প্রতি বৎসর একটা না একটা দুর্ভোগ লাগিয়াই আছে বলিয়া তাজুর বা তাহার মায়ের কাহারো সাধ পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের অন্তরঙ্গতার কথা সকলেই জানে। সুযোগ পাইলে পরিহাস না করে এমন জন নাই।

খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। প্রকাণ্ড তিনমুখী উনুনে খেজুর রস আর ধানের হাঁড়ির একঘেয়ে শন শন শব্দ। তাহার এবং বেড়ার ওধার হইতে ভাসিয়া আসা কাঁঠাল কুঁড়ির গন্ধ গভীর কালো রাত্রির মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে। আকাশে ছোট একফালি চাঁদ। সারা গাঁ নিঝুম—কেবল দূরে মল্লিক বাড়ির দিক হইতে কালু বয়াতির কণ্ঠ শোনা যাইতেছে—হয়তো ধানমাড়াইকে উপলক্ষ্য করিয়া উহাদের উঠানে জারীগানের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। রিজিয়া উৎকর্ণ হইয়া গানের কথা ধরিবার চেষ্টা করিল।

চাচী কঞ্চির আগায় একগুচ্ছ 'কুটা' উনুনের মুখে ঠেলিয়া কহিলেন—এতো কম উঠল ধান। চক্রবর্তী মশাই আর সমিতির টাকা পারবে শোধ দিতে।

তাজু যেন অন্য কোনো জগৎ হইতে নামিয়া আসিল। চাচীর প্রশ্নে বুকভরা শ্বাস লইয়া কহিল—সেকথা ভেবে তো কিনারা পাচ্ছিনে চাচী। এ ধান বেচে কাপড় কিনবো না ধার শোধ দেবো। মায়ের আমার কাপড়জামা না হলেও চলে না—দেখছো তো অবস্থা। মা-ছেলের কাপড়ে তালিতে তালিতে কোথাও ফাঁক নেই। চেষ্টা করবো এখন না দেবার—খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলে না হয় আর এক কুড়া বেচে দেবো। তাও যদি ধানের দর পড়ে। নইলে না-দেবারই চেষ্টা করবো।

ধান চাল বেচিয়া গতবার রাজা হইয়া গিয়াছে হলধর চক্রবর্তী। চল্লিশটি মাত্র টাকা কিছুদিন পরে দিলেই বা এমন কি লোকসান হইবে তাহার।

কথায় কথায় চাচীর ধান সিদ্ধ হইয়া গেল। রাত্রিও তখন অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে—তাজ্ উঠিয়া পড়িল। শুইবার আগে ঘরে সাজানো ধানের সাজিগুলির উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। ভালো হয় নাই একেবারে। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা, কর্জ শোধ, খাজনা, খাওয়া-পরা, বিবাহ—পাঁচকুড়া জমির এহেন ফসলে কেমন করিয়া সব কুলাইবে।

এদিকে রিজিয়াকে আপন করিয়া লইবার ইচ্ছাটা দুদমনীয়। ক্রমান্বয়ে সে লোভনীয় হইয়া উঠিতেছে; ভরা ভরা মুখ চোখ, গা-হাতপায় ঝলকাইতেছে যেন পাকা কদলীর লাবণ্য। টল টল করা চক্ষু দুইটিতে বঙ্কিম দৃষ্টি ভরিয়া তাহার দিকে তাকাইলে অভাব অনটনের পৃথিবী তাজুর সম্মুখ হইতে যেন লুপ্ত হইয়া যায়। দারিদ্র্যের সহস্র ছোবলও যেন আর নাগাল পায় না তাহার। কিন্তু বিবাহ হইবে কী প্রকারে, খরচপত্র কই? না, আর একটা বৎসর প্রতীক্ষা করিবে? নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁথাখানা মুড়ি দিয়া তাজু এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন হাটে রওনা হইবার মুখে রিজিয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—নবান্নের সময় কী বলেছিলে মনে আছে?

—কী?—তাজুর সহসা কিছু মনে পড়িল না।

—বাঃ, বলেছিলে না নতুন ধান বেচে আমায় একটা কিছু দেবে? সেই মুরগীর ছানা—

—ওঃ!—বিরক্তচিত্তে ঢিল ছুঁড়িয়া একটা মুরগীর ছানা মারিয়া ফেলিয়াছিল তাজু—

ঘটনাটা রিজিয়ার দেখিল কিন্তু মায়ের কাছে কহিয়া তাহাকে বকুনি না খাওয়ায়, সেজন্য একটা ঘুষ কবুল করিয়ছিল—নহিলে, মুরগী-হাসের প্রতি তাহার মায়ের যে-দরদ।—শুনিলে তাজুর আর রক্ষা থাকিত না।—সে কথা তো ভুলেই গেছলাম। তুমিও তো মনে করিয়ে দাওনি। বল না হয় আজই কি আনবো?

তাহার মুখের হাসিটা হয়তো স্বাভাবিক দেখাইল না, রিজিয়া এক লহমা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নিচু চোখে কহিল—থাক এখন,—চারিদিকে যা টানাটানি।—চেষ্টাকৃত হাসি আনিয়া বাঁ হাতে আঁচলটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে আর একবার সে তাজুর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল।

তাজুর মুখে মুহূর্তের জন্য একটু কালোছায়া নামিয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—সেজন্য তোমায় গিন্নীপনা করতে হবে না। কী চাও বলো না?—বলিতে বলিতে সে লক্ষ্য করিল, ডান হাতে কি জিনিস সে পিছনে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

—থাক আজ—তুমি যাও।

—বাঃ!—দেখি তোমার হাতে কি?

রিজিয়া আরো লুকাইল—না।

তাজু কী মনে ভাবিয়া দুষ্টুমি করিয়া তাহার হাত হইতে জিনিসটা কাড়িয়া লইতে গেল; রিজিয়া আর জোর করিল না—তাজু হাতখানা ধরিতেই তাড়াতাড়ি জিনিসটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। মোম দিয়া তৈরী একছড়া ঝুটা মুক্তার মালা! খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য রিজিয়ার দিকে মুখ তুলিয়া

চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল—ওটা এমনি হাতে রেখেছিলাম—দাও।

তাজু সে কথায় কোনো আমল দিল না—ওঃ এই! ঝুটামুক্তার মালা যে তা বুঝতে পেরেছি। কার ওটা?

—সইয়ের

—কোথা থেকে এনেছে, দাম কতো বলতে পার?

রিজিয়া তাহার হাত হইতে মালাছড়া লইয়া কহিল—হাটে বিশ্বাসদের দোকান থেকে এনেছে। কতো দাম কি জানি! তুমি যাও দেরি হয়ে যাবে আবার।

—ওটা দাও তা হলে—পেলে একছড়া আনবো।

—পাগল, পেটের ভাত জোটে না—যাও যাও তুমি, নইলে কেউ দেখে ফেললে ঠাট্টা শুরু করবে।—রিজিয়া সরিয়া গেল।

তাজু হাসিয়া কহিল—গিন্নী হবার আগেই তোমার অতো ভাতের ভাবনা করতে হবে না। তুমি সজাগ থেকো ফিরতে আমার রাত হবে। পেলে নিশ্চয়ই আনবো।

হাটে ধান বিক্রী করিতে করিতে প্রায় বিকাল হইয়া আসিল।

তাজু কেবলই আশঙ্কা করিতেছিল হলধর চক্রবর্তীর সঙ্গে যেন দেখা না হয়। দেখা হইলে সে তাহার প্রাপ্য আদায় না করিয়া ছাড়িবে না। তাই তাহার অনুচর হাকিম খাঁ যখন ধানের দর জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেল, তাজুর মনে সেই শঙ্কাটা আরো বাড়িয়া উঠিল। দর বাড়িবার অপেক্ষায় আর না বসিয়া তাড়াতাড়ি সব ধান বিক্রী করিয়া চল্লিশটি টাকা ট্যাঁকে লইয়া তাজু উঠিয়া পড়িল।

কাপড়ের দোকানে ভারি ভীড়। দোকানের এক কোণে দাঁড়াইয়া তাজু হিসাব করিতে লাগিল কি কি কিনিবে। মায়ের একটা কোর্তা

হইবে দুই বা তিন—ধুতি শাড়ি দুই জোড়া অন্তত বারো টাকা—আলোয়ান এক খানা পাঁচ, তাহা ছাড়া তেল, লবণ—নানান সওদা আছে।—রিজিয়ার জন্য সেই রকম এক ছড়া মালাও নিতে হইবে। সুতরাং কাপড়ের দোকানে আঠারো-উনিশ টাকার বেশি কিছুতেই খরচ করা চলিবে না। তাজু এই সব হিসাব করিতেছে এমন সময় হাকিম কোথা হইতে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া কহিল—কী মর্দ, কাপড় কিনতে এলে বুঝি ?

তাজুর বুক ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। হাঁ-না করিয়া কেমন অদ্ভুত-ভাবে মাথা নাড়িল।

—এসো তাহলে—আমারো ভাই একখানা আলোয়ান দরকার—বলিতে বলিতে ক্রেতাদের ভীড় ঠেলিয়া সে সম্মুখে আগাইয়া গেল। তাজু কেমন অস্বস্তি অনুভব করিয়া তাহার বাহির হইয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। খালে ধানের বেপারীদের নৌকোয় আলো জলিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা হাটের কোলাহল কমিয়া আসিতেছে এখন। কামারশালের দিকে হাতুড়ির শব্দ।

মা হয়তো রোজকার মতো রান্নাবান্না শেষ করিয়া এতক্ষণে রিজিয়াদের চুলাশালে আসিয়া কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছেন। অন্যদিনের তুলনায় আজ তাহার মুখরতা নিশ্চয়ই আরো বেশি। নতুন কাপড় জামা কিনিয়া মা ছেলেমানুষের মতো খুশি হইয়া ওঠেন। বুড়ো মানুষ, শীতে কষ্ট পাইয়াছেন এতোদিন। আজ যা-শীত পড়িয়াছে—হয়তো তিনি চুলার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছেন ; মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন শীতের কথা। চাচী বা রিজিয়া হয় তো বলিয়া উঠিতেছে, আর কতক্ষণ বা তাজুতো এলো বলে !

রিজিয়া কাহিনী শুনিতে বসিলেও হয় তো কান পাতিয়া রহিয়াছে জলের ঘাটে তাজুর নৌকোর শিকল নাড়ার শব্দের প্রতীক্ষায়। কিন্তু তাজু যাইয়া প্রথমে এমন ভাব দেখাইবে যেন মালার কথা তাহার মনেই ছিল না। রিজিয়া হতাশ হইয়া দূরে দূরে থাকিবে। কিন্তু মুখে কিছু জিজ্ঞাসাও করিবে না। তারপর তাজু একান্তে তাহাকে চুপি চুপি ডাকিয়া লইয়া নিজের হাতে—হঠাৎ তাজু চমকিয়া উঠিল। হলধর চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর! হ্যাঁ হলধর চক্রবর্তীই দোকানদার বৈকুণ্ঠ সাহাকে বলিতেছেন—আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল। কিন্তু এই কটা কাপড় চোপড়ের এত দাম, তুমি যে মুশকিলে ফেল্‌লে বৈকুণ্ঠ।

তাজু ভয়ে ভীড়ের একপাশে দোকানের বেড়ার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল, দেখিয়া না ফেলে হলধর চক্রবর্তী।

—তাইতো। মুশকিলে ফেল্‌লে! এখন আর টাকা কোথায় পাই—ধারকর্জ নেবার মতোও তো কাউকে দেখছি না।

তাজুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিতে পাইলে হয়তো তাহার নিকটেই চাহিয়া বসিবে হলধর। চুপি চুপি দোকান ত্যাগ করিয়া সে নামিয়া যাইতেছে; হঠাৎ হাকিমের স্বর শোনা গেল—ঐ, ঐ তাজু আছে, তাজুর কাছে চেয়ে দেখেন ও আজ ধান বেচেছে।

তাজুর পায়ের গতি হারাইয়া গেল। ফিরিয়া বড় বড় চোখে হলধর চক্রবর্তীর দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞসা করিল—কী?

হাকিম আগাইয়া বলিল, চক্রবর্তী মশাইএর গোটা পঁচিশেক টাকা দরকার—তাই চাইছেন! তাজু হাবার মতো চুপ করিয়া রহিল, ট্যাঁকটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল ডান হাতে। চক্রবর্তীকে বড়ো ভয় হয় তাহার। তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলে; তাহার কথাবার্তা, চালচলন, দৃষ্টি—সবই যেন কী এক

সম্মোহন। শুকনো গলায় শুধু কহিতে পারিল—আমারও যে সওদা নিতে হবে।

—বলো কী, পঁচিশ টাকায় সওদা করো নাকি আজকাল!

চক্রবর্তী ভুরু কোঁচকাইয়া ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

হাকিম মন্তব্য করিল—করলেই বা কি পৌষ মাসের দিন!

—আরে দেবে তো দাও—না হয় ধারই দাও, তোমার সওদা কাল নিলেও চলবে। দাও—কাল আমার বাড়ি থেকে নিয়ে এসো।

হলধরের প্রসারিত হাত তাজুকে যেন আরো নির্জীব করিয়া ফেলিল। ট্যাঁকের উপর হইতে হাতখানা যেন অবশ হইয়া নামিয়া গেল।

—ও কী চুপ করে তাকিয়ে রইলে দেখি!—তোমার কাছে চক্রবর্তী মশাইএর তো পাওনাও আছে কতো!

তাজুর মনে হইল ক্ষোভে দুঃখে বুঝিবা সে কাঁদিয়াই ফেলিবে। ষড়যন্ত্র! কৌশল করিয়া টাকাটা আদায় করিয়া লইল হলধর আর হাকিম খাঁ! হলধর চক্রবর্তী টাকার কুমীর। কতোটুকু ক্ষতি হইত তাহার ঐ ক'টি টাকা তাহার নিকট পড়িয়া থাকিলে! হাকিম শয়তানী করিয়া না জানাইলে হয়তো এমন ঘটিত না। হাকিমের উপর দুরন্ত আক্রোশে তাজুর দুইহাত হঠাৎ মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল।

হলধর কাপড়ের পোঁটলাটি লইয়া আগে নামিয়া গেলেন। হাকিমও নতুন কেনা আলোয়ানখানা কাঁধে ফেলিয়া নামিয়া যাইতেছে—এমনসময় তাজু হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। উন্মত্তের মতো কয়েকটা ঝাঁকুনী দিয়া বিকৃত কণ্ঠে কী বলিয়া উঠিল সেই জানে। কিন্তু হাকিম জোয়ান লোক—নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে তাহার সময় লাগিল না। সাত আটটি লোক

তখন দোকানে। হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। হাকিমের লাঠির আঘাতে তাজুর কপাল ফাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত ছুটিল। হঠাৎ যে কেন এমন ঘটিল ভাবিয়া সকলেই প্রথমটা একটু হতভম্ব। হলধর কি ভাবিয়া পুলিশ-নৌকার দিকে আগাইয়া গেলেন। হাকিমও ফুঁশিতে ফুঁশিতে তাহার অনুসরণ করিল।

রক্তাক্ত মস্তক তুলিয়া সভয়ে সেদিকে তাকাইল তাজু। কি করিয়া বসিল সে! এবার হয়তো ভিটে মাটি গ্রাসেরও সুযোগ দিল হলধর চক্রবর্তীকে, উহাদেরই এখন পৌষ মাস। পৌষলক্ষ্মীর প্রসাদে সকলেই আপন আপন সাজি ধরিতে ব্যস্ত। এতোটুকু দয়ামায়া, সহানুভূতি নাই তাহাদের চিত্তে।

শেষ হউক, হে ঈশ্বর, শেষ হউক এই দয়াহীনতার।

# শেষপ্রহর

পৃথিবীতে আর কাহাকেও বিশ্বাস নাই। সকলেই আপন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। যাহাদের তুমি অতি আপন জন মনে কর তাহারাও নিজের প্রয়োজনে তোমার জন্য মুহূর্তেকও না ভাবিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। সারা ছুনিয়াটাই হারামীতে ভরা। নির্জন ঘরে, পরিত্যক্ত অবস্থায় অসহ্য রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত না পাইয়া হোসেন এই নিষ্ঠুর সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছে।

হাজী সাহেব বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো এ কথার প্রতিবাদ করিয়া হাসিয়া বলিতেন অনেক ভালো কথা, কিন্তু সে যদি জিজ্ঞাসা করিত আজ এযাবৎ যাহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালোবাসিয়া আসিয়াছে, সে তাহাকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যায় কি করিয়া? তাহা হইলে কি জবাব দিতেন তিনি একবার শুনিয়া লইত হোসেন! সব মিছা—ছুনিয়াতে ভালো মন্দ, পাপপুণ্যের কোনো সুবিচার নাই। মানুষকে লইয়া হয়তো খোদাতালাও কৌতুক করেন। যন্ত্রণায় পাশ ফিরিয়া ওধারের খোরাটার অবশিষ্ট জলটুকু একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া হোসেন একটা খেদোক্তি করিয়া আবার শুইয়া পড়ে। ভাগ্যে রহমালী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, নহিলে এইটুকুও তাহার জুটিত না। অভিশাপের ভয় দেখাইয়া এই জলটুকু তাহার দ্বারা আনাইয়া লইয়াছে। জলভরা খোরাটা ঠেলিয়া দিয়াই সে একপ্রকার ছুটিয়া পলাইয়াছে। হোসেন কাতর অনুনয় করিয়া কহিয়াছে—আমার শ্বশুরবাড়িতে একটা খবর দিও ভাই, অন্তত সে যেন শেষ দেখাটি দিয়া যায়। সে বলিয়াছে কি

বলে নাই, কে জানে। দিনের আলো নিভিয়া রাত্রি ঘন হইয়া আসিল। কোথায় সে? নিষ্ফল তাহার প্রতীক্ষা। হোসেন ঘুমাইতে চেষ্টা করে, ঘুম আসে না। মাথা স্থির হয় না। আজেবাজে নানা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে।

ধুমধাম করিয়াই সে রাবেয়াকে বিবাহ করিয়াছিল। আপন বাড়িতে সে ছিল একা। কয়েক কুড়া জমি লইয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটিত। চাষের সময় নিজের ক্ষেতের কাজ হইয়া গেলে অপরের ক্ষেতে 'বদলা' দিয়া সাহায্য করিত। ইলিশ মাছের দিনে রাত্রে দল বাঁধিয়া জাল লইয়া গাঙে যাইত। প্রতিবারেই প্রচুর মাছ ধরিয়া আনিয়া নিজের জন্য মাত্র একটা রাখিয়া বাকিগুলি গ্রামের ঘরে ঘরে ভাগে ভাগে দিয়া আসিত। একদিন এতো মাছ পাইল যে, পাশের গাঁয়ে ( আগে যেখানে তাহার ফুপার বাড়ি ছিল, এখন সেখানে কেহই নাই, একটি মাত্র ফুপাত ভাই, সেও যুদ্ধে না কোথায় চলিয়া গিয়াছে )—তাহার ফুপার প্রতিবেশী আজাহার হাওলাদারকেও একটা মাছ আসার পথে দিয়া আসিল। সেই দিন প্রথম রাবেয়াকে দেখিল। মনটা যেন সেইখানেই গাঁথিয়া রহিল।

আজাহারদের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা তাহার নাই। করিতেও পারে না লোকলজ্জার ভয়ে। আজাহার চুরির দায়ে কিছুদিন জেল খাটিয়াছিল। তাহার মেয়েকে বিবাহ করিবার কথা মুখে তুলিলেও সারা গাঁ বোধ হয় ব্যঙ্গে ভরিয়া উঠিবে। তবু ইহার পর আজাহারের দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। পরে ইহা লইয়া কেহ কেহ ঠাট্টাও করিল। লজ্জায় পড়িয়া সে আর ওদিকে পা বাড়াইতে সাহস পায় নাই। ইতিমধ্যে আজাহার আবার একটা ডাকাতি মামলায় পড়িয়া জেলে গেল এবং কিছুদিন পরেই হাজী সাহেব তাহার হইয়া একটা অনুরোধ করিয়া বসিলেন।

সারা গাঁ এই লোকটিকে ফেরেশতার মতো ভক্তি করিত। কিন্তু হোসেনের মতো আর কেহই তাহার কাছে আসিয়া এতো সময় কাটাইত না। দীর্ঘদেহী, শীর্ণ, সাদাসিদা বেশ পরা, আবক্ষ শুভ্র শ্মশ্রুময় মানুষটি। ঠোঁট আর চক্ষু দুইটিতে হাসি ভালোবাসা মিষ্টিকথা যেন সর্বদা ভরপুর হইয়া থাকিত। সমস্ত গাঁয়ের এবং আশে পাশের দুই তিনখানা গ্রামের সকল নারী পুরুষ, ছেলে মেয়ের সঙ্গে সহজ সমান ভাবে মিশিতেন—দিল খোলা হাসিতে বহু ম্লানমুখও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন। পথে বাহির হইলে, যাহার সাথেই দেখা হউক না কেন, থামিয়া দুইদণ্ড কুশল প্রশ্ন করিয়া, দোওয়া করিয়া দ্রুত পদে সম্মুখে আগাইয়া যাইতেন। যাইতেন গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে; কাহারো রোগব্যাধি হইলে নিজের লেখা তাবিজ বা টোটকা ঔষধ দিতেন। খবর দিতে হইত না, দেখা যাইত যেন আপন পুত্রকন্যার বিপদ জানিয়া তিনি পথ বাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। সংসারে 'আপন বলিতে তাহার কেহ নাই, বোধ হয় সেইজন্যই অনুরূপ একক হোসেনের জন্যই তাহার মনের সবটুকু স্নেহ উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। হোসেনের বাড়ির সবাই যখন কলেরায় উজার হইয়া গেল তখন একমাত্র এই হাজী সাহেবই তাহাকে সান্ত্বনার হাতে ধরিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নয়, পাশে পাশেও ছিলেন। বিবাহের পূর্বে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা পয়সা সবই তাহারই পরামর্শে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। শুধু পিতার সম্মান দিলেও সব বলা হয় না, হোসেনের জীবনে তিনি ছিলেন খোদারই মূর্তিমান স্নেহাশীষের মতো।

তিনি বলিলেন রাবেয়ার পিতার ইচ্ছার কথা। পুলিশের সঙ্গে যাইবার আগে সে নাকি তাহার কাছে বলিয়া গিয়াছে রাবেয়ার সঙ্গে যেন

হোসেনের বিবাহ হয়। রাবেয়ার মাও হাজী সাহেবকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপরে অভিভাবক কেহ নাই; মেয়ে অরক্ষণীয়া। পাশের গাঁয়ের ইয়াকুবের অভিসন্ধি ভালো না, আজাহারের কাছে একবার প্রস্তাব করিয়া বিফল হইয়াছে, এবার হয়তো সুযোগ বুঝিয়া মেয়ে জোর করিয়াও লইয়া যাইতে পারে। আজাহারকে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর সে ঘন ঘন ওদিকে আসাযাওয়া করিতেছে। তাহা ছাড়া, আজাহারের অবর্তমানে জমিজমার কি দশা হইবে? হোসেন তাহাদের সকল দুরবস্থা হইতে বাঁচাউক।

হোসেন মাথা নিচু করিয়া সংকোচভরে তাহার কথাগুলি শুনিল। অবশেষে যখন প্রশ্ন করিলেন—তোমার মত কী? আনন্দের আতিশয্যে হয়তো বা তখুনি সে মত দিয়া ফেলিত, কেবল সংকোচেই পারিল না; ভাব দেখাইল যেন তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই, তবে তিনি যদি ভালো মনে করেন—হাজী সাহেব ধীরভাবে তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন—তিনি ভালো মনে না করিলে কখনো একথা নিজে বলিতেন না। আজাহার চোর নামে পরিচিত হইলেও সে অন্তরে বাস্তবিকই নিষ্পাপ। একদিন অভাবে পড়িয়া চুরি করিতে গিয়াছিল, ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়া আসিয়াছে। তবু কী তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? আর এবার তো শুধু দাগী বলিয়াই আবার তাহাকে দুর্ভোগে পড়িতে হইল। নহিলে সে যদি পেশাদার চোরই হইত তবে ইয়াকুবের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিল না কেন? ইয়াকুবও যে চোর একথা কে না জানে! তবে তাহার পাপের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপও তাহার নাই। আজাহার একদিন বাধ্য হইয়া পাপী হইয়াছিল, তাহার অনুশোচনায় হোসেন আজ যে স্থানটিতে তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে, ঠিক ঐ স্থানে বসিয়াই সে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছিল। কেহ সেকথা জানে না, জানিবার

প্রয়োজনও বোধ করে নাই। নিজের বাঁচিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া মানুষের দরবারে সে দোষী সাব্যস্ত হইলেও খোদার কাছে তাহার কোনো পাপ নাই।—ব্যথিতভাবে হাসিয়া পরে কহিলেন —গাঁয়ের লোকে কী ভাবিবে সে দুর্ভাবনা করিও না। তোমার মনে জোর থাকিলে উহাদেরও ভাবাভাবির কিছু থাকিবে না।

সুতরাং বেশ একটু ধুমধাম করিয়াই সে রাবেয়াকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম কিছুদিন সুমধুর উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। স্বপ্ন সার্থক হইল সত্য কিন্তু ওদিকে শাশুড়ী ও নাবালক দুটি শালাশালীর ভরণপোষণের ভারও ক্রমে তাহার উপর আসিয়া পড়িল। হোসেন তাহাতে কোনো রকম না দমিয়া বরং একটু নবীন জীবনের আস্বাদ পাইল। ক্ষেতে খাটিয়া খুটিয়া বাড়ি ফিরিয়া হয়তো দেখিত রাবেয়া তাহারই জন্য ভাত রাঁধিতেছে। পিছনে দাঁড়াইয়া গৃহস্থালীরতা তাহাকে নতুনরূপে দেখিয়া সারা মনে এক অদ্ভুত পুলকের জোয়ার আসিত; পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে যাইয়া অতর্কিতে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিত। দুষ্টামি করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথাটাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া রাখিত। কোনোদিন বা ক্ষেতের কাজ শেষ হইয়া গেলেও ইচ্ছাবশতই দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিত। একটি প্রাণী যে তাহার একান্ত আপন, শুধুমাত্র তাহারই বধূ—তাহার জন্য দুশ্চিন্তায় পথ চাহিয়া আছে—গোরু দুইটা ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় শুইয়া শুইয়া এ কল্পনা করিতেও তাহার সুখের সীমা থাকিত না।

হাজী সাহেব প্রতিদিন একবার করিয়া খবরাখবর লইয়া যাইতেন। সংসারের খুটিনাটি, কাজ কথা লইয়া তিনি শিশুর মতো কৌতুক করিতেন। নাতির আগমনের জন্য তাহার ব্যস্তা দেখিয়া উহারা শরমে রাঙা হইয়া উঠিত। কখনো কখনো হোসেনের মনে হইত, এই

সুন্দর আত্মীয়তার পরিবেশ ছাড়া জীবনে অধিক সুখ আর তাহার কাম্য নাই।

মাঝে মাঝে তিরস্কারও শুনিতে হইত। একদিন আসিয়া দেখিলেন সর্দির শরীরে এককুড়ি কই লইয়া হোসেন শ্বশুর বাড়ি যাইতেছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন বেশ একটু জ্বরও রহিয়াছে—এই দেহে তুমি জল কাদা ভেঙে রওনা হচ্ছো? বৌ কোথায়, সেই বা কোন বুদ্ধিতে তোমাকে বাইরে যেতে দেয় শুনি?

হোসেন তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠিয়া হাঁড়িটা ঠেলিয়া রাখিল। রাবেয়া ঘরেরই বাহির হইল না। মৃদু ভৎর্সনা ও উপদেশে হাজী সাহেব কহিলেন—হাঁড়িটা দাও আমার কাছে আমিই দিয়ে আসছি!

—সে কী!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ দাও—আমার একটু কাজ আছে সেদিকে।

কোনো আপত্তি টিকিল না।

তিনি চলিয়া যাইবার পর রাবেয়া মুখভারী করিয়া দাওয়ায় নামিয়া আসিল।

—উনি আমার নামে অপবাদ দিয়ে গেলেন, আর তুমিতো বেশ চুপ করে রইলে!

—অপবাদ!

—বাঃ, অপবাদ নয়?

—দূর!—সত্যি সত্যি উনি রাগ করে বলেছেন নাকি কিছু! ওঁর মতো মানুষ সারা দেশে আর নেই!

—কী জানি বাপু! সেদিন বলে গেলেন—তুমি ক্ষেতে এতো অতিরিক্ত সময় খাটো সেও নাকি আমার জন্য। কেন তোমাকে বেশি খাটতে দেই ইত্যাদি কতো কি দোষ দিয়ে গেলেন।

—ত্যুৎ! ঐসব কথা কী ধরতে আছে! ওতো আদর করে বলেছেন। মনে নেই সেদিনের কথা—উন্নুন ফুঁয়োতে ফুঁয়োতে তোমার চোখের পানি পড়া দেখে কী রকম রেগে আমাকে বকেছিলেন যে, শুকনো লাকড়ি এনে দেই না, এসে কেবল নবাবের মতো খাই, কচি বউটাকে তুই মেরেই ফেলবি।—আমি তো ক্ষেত থেকে ঘরে পা দিয়ে এই কথা শুনে পিছন ফিরে দে দৌড়!

কিন্তু রাবেয়ার মুখে হাসি ফুটিল না; হোসেনের হাতের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া যাইতে যাইতে কহিল—যা হোক, মাছগুলো মা পেলে হয়!

হোসেন অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিরক্ত হইল, এবং বোধ হয়, দাম্পত্য জীবনের এই প্রথম বিরক্তি।

হাজী সাহেবের কথা সত্য, বিবাহের সময় গাঁয়ে একটু কানাঘুষা হইয়াছিল মাত্র। এখন তাহা থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আগেকার সেই অন্তরঙ্গতা যেন আর নাই। আগে সকলে স্নেহ করিত—এখন সমীহ করে। ভারী চোখে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করে; যে আসরে পূর্বে গেলে সহজভাবে মিশিতে পারিত এখন সেখানে যাইবামাত্র আসর ভাঙ্গিয়া যায়। সঠিক কিছু সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, চোরের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই উহাদের ব্যবহারটা বদলাইয়া গেল, না তাহার সুখ সচ্ছলতাকে তাহারা ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে?

কিন্তু তাহার এই সুখ সচ্ছলতা আর বেশিদিন ভোগ করা চলিল না। শ্রাবণ মাসের গো-মড়ক ভাঙনের ভূমিকা রচনা করিল। হালের একটি বাছুরও অবশিষ্ট রহিল না। গোরুর দাম আগুন—কিনিবার মতো টাকা সহসা সংগ্রহ করিতে পারিল না। শ্বশুরের গোরু

শাশুড়ী অভাবের অজুহাতে আগেই বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে। হাজী সাহেবের কাছেও পঞ্চাশ টাকার অধিক জুটিল না। বাধ্য হইয়া নিজের জমির প্রায় সবই বিক্রি করিয়া দুইশত টাকায় সে দুইটি গোরু কিনিল। শ্বশুরের জমিই চাষ করিল।

ভাদ্র গেল—আশ্বিন গেল—আসিল কার্তিক মাস। দুঃখের রজনী শুরু হইয়া গেছে। সর্বগ্রাসী অভাব ধীরে ধীরে জীবনের সকল নিশ্চিন্ততা দূর করিয়া হোসেনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ঘরের সঞ্চিত খাদ্য ফুরাইল; ধার কর্জ পাইবার আশা যেখানে ছিল তাহারাও হাত গুটাইল। কেবল সে-ই নহে, আরো অনেকে যেন তাহারই মতো অনন্ত দুঃখতমসার মধ্য হইতে আশার আলোকের সন্ধান করিতে লাগিল। চাউলের মূল্য লাফাইয়া লাফাইয়া পঁয়ত্রিশে উঠিয়া গেল অথচ মাত্র সাড়ে ছয় টাকা দরে গত পৌষের চাউল সে বেচিয়া দিয়াছিল।

হাজী সাহেব তালুকদার বাড়ির জুমা মসজিদের ইমাম। তিনি তালুকদারদের নিকট হইতে কিছুদিন ধার কর্জ আনিয়া হোসেনের প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু উহারাও স্পষ্ট ভাষায় অধিক সাহায্য করিবার অসামর্থ জানাইয়া দিল। কি করিবে ভাবিয়া হোসেন অস্থির হইয়া উঠিল।

হাজী সাহেব মিলাদ পড়াইয়া যে টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন—সব হোসেনকে আনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু লোকে যেন ধর্মকর্ম ভুলিয়া গেল।

রাবেয়া ইতিমধ্যে বাপের বাড়ি গিয়াছিল। দিশেহারা হোসেন সান্ত্বনাদাত্রীর অভাববোধে তাহাকে লইয়া আসিল। তাহা ছাড়া ইয়াকুব আবার তাহার শ্বশুর বাড়ির দিকে আনাগোনা শুরু করিয়াছে—কি মতলব লইয়া কে জানে!

কিন্তু রাবেয়ার ব্যবহার আরো অস্বস্তিজনক হইয়া উঠিল। সে মনে করে সংসারের এই দুঃখদুর্দশার জন্য হোসেনই দায়ী। ইচ্ছা করিলেই নাকি ইহা দূর করা যায়!

ছেলেমানুষী ভাবিয়া সে প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে, এইরকম অভাব কেবল আমাদেরই ঘরে নয় বৌ, যুদ্ধের জন্য সারা দেশ ছারখারে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝাইলেও সে বোঝে না। উত্তরোত্তর তাহার গঞ্জনা বাড়িয়া চলিল।

—এরকম আধপেটা খাইয়ে উপোস করিয়ে রাখবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?

হোসেন নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

—তোমার মতো ভালোমানুষের দশাই এই হয়। সারাদেশে অভাব লেগেছে বলছো, কিন্তু উপোস করেছে কে, বলতে পারো?

হোসেন উদাহরণ দেখাইয়াছে; রাবেয়া ঝংকার দিয়া কহিয়াছে—ওরা তো ভিক্ষুক। তুমিও কি ওদের মতো বলতে চাও?—পরে বলিয়াছে—বাঁচতে হলে কেবল ভালোমানুষী আর হাজীদের লেজুর ধরলেই চলে না, ভালোমন্দ দুদিকই সমান রাখতে হয়। ঐ গাঁয়ের ইয়াকুবকে দেখো না, কী আছে তার, অথচ একদিনও আধপেটা খেয়ে ছিলো বলতে পারবে?

হোসেন রাগ সংবরণ করিয়া ঘর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। রাবেয়া তাহাকে তুচ্ছ করিতে আরম্ভ করিল, নহিলে একটা চোরের সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা দেয় কি করিয়া!

দীর্ঘশ্বাসে বুক ভারী করিয়া সে হাজী সাহেবের কাছে যাইয়া বসিল। তাহারও পরিবর্তন আসিয়াছে। পূর্বের সেই লঘুতা আর নাই; ঠোঁটের চঞ্চল হাসিটুকু মিলাইয়া গেছে। চোখের পক্ষ্মে

কি এক ম্লান ছায়া দিন দিন গাঢ় হইয়া নামিয়া আসিতেছে। তসবীহ্ (জপমালা) হাতে লইয়া তিনি আল্লার নাম করিতেছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুর অন্তরাল হইতে রক্তিম ঠোঁট দুইটি বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ইঙ্গিতে হোসেনকে বসিতে বলিলেন।

হোসেন ভাবিল, কাহাদের জন্য হাজী সাহেবের এই পরিবর্তন ঘটিল; নিজের তো কিছুই নাই, অন্নবস্ত্র দেয় তালুকদারেরা। তবে কাহাদের দুঃখ বেদনায় হাজী সাহেবের প্রাণবান হাসিটি মিলাইয়া গেল? তাহার ব্যক্তিগত অন্তর কোনোদিন কোনো কথা কহিল না!

—জোটাতে পারলে কিছু? হাজী সাহেব প্রশ্ন করিলেন।

—না।

—যাক, শোনো কাঠিপাড়া গ্রামের নিবারণ দাসের কাছে আমি কিছু চাল চেয়েছিলাম, সে বলেছে দেবে। তুমি এখুনি সেখানে রওনা হয়ে যাও। আজ খেয়েছো কিছু? অকস্মাৎ হোসেনের সমস্ত অন্তরাবেগ উঠিয়া আসিয়া পরমুহূর্তেই গলার কাছে আসিয়া থামিয়া গেল, মনে হইল, পৃথিবীতে তাহার একান্ত আপনজন কেহ থাকিলে সে হাজী সাহেব। আজ দুইদিন ধরিয়া ক্ষুদ ফ্যান খাইয়া আছে, কেহ একটিবারের জন্যওতো এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই! চোখের জল চাপিতে পারিল না।

হাজী সাহেব ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন—ছিঃ, এতো নরম হয়ে পড়লে কেন? দুনিয়াতে কতো বিপদ মসিবত আছে। বুক ফুলিয়ে তার সঙ্গে যে লড়াই করতে পারে সেইতো মানুষ! তোমার আর কি অবস্থা, এই দেখো খবরের কাগজে কী লিখেছে—

ওপাশের মাদুরের উপর হইতে হাজী সাহেব সংবাদপত্রখানা

হাতে লইলেন—এই দেখো, তুমি আমি তবুতো যাহোক বেঁচে আছি, কিন্তু দেখোতো এই ছবি, না খেয়ে রাস্তায় কতোলোক মরে পড়ে আছে।—হাজী সাহেব ছবির পর ছবি দেখাইলেন, খবরের পর খবর তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। হোসেনের মন, সেইসব শুনিতে শুনিতে, অদ্ভুত ভয় ও শঙ্কায় ভরিয়া গেল। মনে হইল, কোনো বিরাট রোমশ মৃত্যু দূর দিগন্ত হইতে তাহাদের দিকে ক্রমশ আগাইয়া আসিতেছে।

—কর্মফল, গুনাগারির জন্যই আজ আমাদের উপর এই বিপদ মসিবত পড়েছে। মনে জোর রাখো হোসেন, সৎ ও ন্যায়পথে যে থেকেছে খোদার দুনিয়ায় সে চিরকাল দুঃখে ভুগবে না। সমস্ত বিপদ আপদ, দুঃখ দৈন্যকে মুছিয়ে দিয়ে এক নয়া জমামা এগিয়ে আসছে।

হোসেন তাহার সবকথা বোঝে নাই। পরম আশ্বাস ও প্রশান্তিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

এক নয়া জমানা আগাইয়া আসিতেছে। আজিকার এ দুঃখরজনী পোহাইবেই। অথচ এই কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। হোসেন আবার কাতরাইয়া উঠিল। খোরাটা টানিয়া দেখিল এক ফোঁটা জল তাহাতে অবশিষ্ট নাই। কে পানি আনিয়া দিবে? সে আসিল না! ধুঁকিতে ধুঁকিতে হোসেন দরজার দিকে চাহিয়া থাকে। কোনো পথিকের আনন্দই কি তাহার বিজন উঠানে বাজিয়া উঠিবে না?

হোসেন আবার ঝিমাইয়া পড়িল।

আধমণ চাউলে আগামী খন্দ পর্য্যন্ত এক রকম খাইয়া না-খাইয়া চলিত; কিন্তু রাবেয়ার মান অভিমানে তাহার অধিকাংশই শাশুড়ীকে দিতে হইল। সুতরাং কিছুদিন পরে আবার পূর্বাবস্থা।

পেটের ক্ষুধা যে মানুষকে এতো কাবু করিয়া ফেলিতে পারে, হোসেন তাহা কোনোদিনই ভাবিতে পারে নাই। দুনিয়াদারীকে হালকা ঝাপসা মনে হয়, আর তাহার মধ্যে একখণ্ড ভারী পাথরের মতো সে পড়িয়া আছে—কিছু করিবার শক্তি নাই, ধীরে ধীরে কে যেন কোন অতলে টানিয়া লইতেছে। খবরের কাগজের সেই ছবিগুলি দুঃস্বপ্নের মতো কেবল মনের সম্মুখে আসা-যাওয়া করে। সে শিহরিয়া ওঠে। কখনো বা ঘুমের ঘোরে নিজেকেও অমনি মৃত অবস্থায় শয়ান দেখিয়া আকুলকণ্ঠে চিৎকার করিয়া ওঠে।

হাজী সাহেব তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। যেখানে যা পান তাহার জন্য লইয়া আসেন। হোসেন দাওয়ায় শুইয়া তাহার প্রতীক্ষা করে। রাবেয়া তাহার নিশ্চেষ্টতার জন্য পরিহাস করে, বিদ্রূপ করে। সে গায়ে মাখে না। কি করিতে পারে সে। কখনো বা ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে।

সেদিনও কিছু খাবার জোটে নাই। রাবেয়া নিস্তেজ হইয়া বসিয়া রহিয়াছিল। তাহার যৌবন ভরপুর দেহেও ভাঙনের ছাপ পড়িয়াছে। হোসেন তাহাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়া কাছে আসিয়া কহিল—বউ, কী দুর্ভাগ্য লাগল আমার! এতো কষ্টও তোকে দিলুম!

রাবেয়া ঝাঁজিয়া উঠিল—থাক, আর আদর দেখাতে হবে না। তুমি তার চেয়ে আমাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসো, তবু তোমার ভালোমানুষী দেখে গা-জ্বালা করবে না।

—কেমন?

—কেমন আর কী, চেষ্টা করলে এই দুর্ভাগ্য কী দূর করা যায় না? তুমি তো শুনতেই পারো না, কিন্তু দেখোতো—

গলা নামাইয়া রাবেয়া, এই দুর্দিনেও ইয়াকুবের সচ্ছলতার প্রতি

ইঙ্গিত করিল। পেটের প্রয়োজনে নারিকেল সুপারিটা চুরি করিলেও কি দোজখে যাইতে হইবে? আর ইহা কী বাস্তবিকই চুরি করা? যাহাদের বড়ো বড়ো বাগান রহিয়াছে, ঘরে অভাবের লেশমাত্র নাই— হোসেন সহ্য করিতে পারিল না—দেখ বউ, রোজ রোজ তুই এতো ইয়াকুব ইয়াকুব কেন করিস বলতো? আমাকে চোর হতে বলিস তুই? না, তুই গিয়ে ইয়াকুবকে নিকে করবি বল, আমাকে রেহাই দে।—অত্যন্ত চিৎকার করিয়া কথা কয়টি কহিয়া সে খুঁটিতে ঠেস দিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

রাবেয়া খানিক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—এই কথাটা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে?—উত্তেজনায় তাহার কথা আটকাইয়া যাইতে লাগিল—পারলে বলতে? বেশ, ছেড়ে দাও আমাকে, খেয়ে বাঁচতে পারি কিনা নিজেই দেখে নেবো। কী হবে তোমার মতো এমন মরদের ঘর না করলে!

তামাকের জন্য শূন্য ডিবেটা হাতড়াইয়া সেটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হোসেন খেঁকাইয়া উঠিল—যা না, কে ধরে রেখেছে তোকে!

তারপর ক্লান্ত কাতর দেহটাকে টানিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

—কোথায় যাচ্ছো, মরদ হও তো তালাক দিয়ে যেদিক খুশি যাও। তোমার বাড়িতে আজই আমার শেষ। রাবেয়া যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সন্ধ্যার দিকে হাজী সাহেব আসিয়া একটা মিটমাটের চেষ্টা করিয়া গেলেন। কিন্তু রাবেয়া জিদ ধরিয়া রহিল—তালাকের কথা যখন হোসেন দুই দুইবার উচ্চারণ করিয়াছে, তালাক তাহাকে দিতেই হইবে। হোসেনের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে।

হাজী সাহেবের আনা চাউল, দাওয়ায় যে অবস্থায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল।

রাত্রে হোসেন একবার রাবেয়ার মান ভাঙাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিল, রাবেয়া আর তাহাতে অনুরক্ত নাই, ইয়াকুবের পৌরুষের প্রতি তাহার টান জন্মাইয়াছে, ইয়াকুবের প্রতি ঈর্ষা এবং নানা দুশ্চিন্তায় মাঝরাত্রি পর্যন্ত তাহার চোখে ঘুম আসিল না।

সেইরাত্রেই নারিকেল চুরি করিতে যাইয়া সে আহত হইয়া ধরা পড়িল। গ্রামের সমস্ত অবরুদ্ধ টিটকারি এই বার মুক্তি পাইয়া পঙ্কিল জোয়ারের মতো হাজী সাহেবের সমস্ত আনন্দ গর্বকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তিনিই বলিয়া কহিয়া হোসেনকে ছাড়াইয়া আনিলেন বটে কিন্তু মনে যে বেদনা পাইলেন তাহাতে তাহার শেষ হাসিটুকুও যেন নিভিয়া গেল। হোসেনকে সাথে লইয়া তিনি তাহার বাড়ি পর্যন্ত যাইতে যাইতে অনেক গ্রামবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য দিনের মতো হোসেন আর তাহাকে আলাপ করিতে শুনিল না। মুখ নিচু করিয়া তিনি আগে আগে হাঁটিয়া যাইতেছেন, যেন তিনিই চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়া বসিলেন, নীরবে হোসেনের ভাঙা-হাতখানা বাঁধিয়া দিয়া, তাহাকে কোনো তিরস্কার পর্যন্ত না করিয়া তেমনি নত মুখে চলিয়া গেলেন।

ভাঙা হাত লইয়া হোসেন নিঃঝুমভাবে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে রাবেয়াকে ডাকিল, কিন্তু কোনো সাড়া পাইল না। উঠিয়া খুঁজিয়া দেখে, ঘরবাড়ি শূন্য, খাঁ খাঁ করিতেছে। রাবেয়া নাই।

সে আর ফেরে নাই। হাজী সাহেব আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া

আবার পূর্বের মতো হোসেনের দেখাশুনা করিতে আসিতেন। বাপের বাড়ি হইতে রাবেয়াকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টাও করিতেছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে অকস্মাৎ দুরন্ত বসন্ত রোগে তাহার অপূর্ব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। মৃত্যুর পূর্বে হোসেনকে বলিয়া গেলেন—সৎভাবে জীবনযাপন করিও হোসেন। দুঃখরজনী, আজ না হউক, কাল পোহাইবেই। প্রতীক্ষা করো—সকল পাপ তমিস্রার অবসান ঘটাইয়া নয়া জমানা আসিবেই।

হোসেন কাঁদিল না, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল এতো জনসমাকুল পৃথিবীতেও সে একাকী। তাহাকে কবর দিবার পরদিনই সে জ্বরে পড়িল। ভাঙা হাতখানা তবু সারিয়াছিল, হাজী সাহেব এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে যাহা আনিতেন খাইত—এখন সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন অবস্থায় বিনা পথ্যে ঘরে পড়িয়া রহিল।

ঘরে শুইয়া দেহের যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে সে বাতাসের গন্ধে টের পায় মাঠের ধান পাকিয়া উঠিয়াছে; মাঠ শুকাইয়া আসিয়াছে। হিম আর কুয়াশা প্রতি ধানগুচ্ছের গোড়ায় পাকে পাকে জড়াইয়া রহিয়াছে। সোনার ধান ঘরে উঠিবার জন্য শিশিরাশ্রুতে কাঁদিতেছে। সে-ও কাঁদিতেছে, সারা গায়ের বসন্ত স্ফোটক বীভৎস মৃত্যুকে ক্রমান্বয়ে নিকটে টানিয়া আনিতেছে। হাজী সাহেব নাই, স্ত্রী ছাড়িয়া গিয়াছে, বারবার অনুনয় করিয়া খবর পাঠাইতেও আসিল না—সারা গ্রামের লোকও সাতঙ্কে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। কেহ একফোঁটা জল দিতেও আসিবে না। খোরাটা শুষ্ক, প্রাণ ওষ্ঠাগত তৃষ্ণায়। হোসেন বিছানায় ছটফট করে, গোঙায়, আবার ঝিমাইয়া পড়ে।

বারবার খবর পাঠাইতেও রাবেয়া ফিরিয়া আসিল না—সে নাকি

সত্য সত্যই ইয়াকুবকে নিকা করিবে। সেই রাত্রের প্রথম দেখা কিশোরী রাবেয়া। ষড়যন্ত্র, সে যেন আগাগোড়া একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছিল। আবার মনে হয়, না, হাজী সাহেব তো সে মানুষ নন। তবে কি তাহার মনে ব্যথা দিবার পাপেই কি আজ তাহার এই দুরবস্থা? হোসেন উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া খোদার কাছে, তাহার কাছে, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। সে যে অন্তরে কতো নিষ্পাপ—তাহা কি খোদা জানে নাই!

ফুসফুস দুইটা যেন আঠা লাগিয়া বুজিয়া যাইতে চায়। পানি, একটু পানি যদি সে পাইত। উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আবার যন্ত্রণায় কঁকাইয়া ভাঙিয়া পড়িল। মৃত্যুর ভয়ে সারা গাঁ তাহার চতুঃসীমানার বাহিরে সরিয়া গিয়াছে, কেহ একদিন খবর লইতেও আসিল না। অথচ ইহাদেরই জন্য বর্ষার গাঙে বৃষ্টিতে ভিজিয়া—

দুনিয়াটা সব ভুলিয়া যায়। হাজী সাহেব থাকিলে বলিতেন—হাঁ, তিনি সারা দিন রাত্রি হোসেনের এই পাইখানা-প্রস্রাবময় বিছানার কাছে বসিয়া তাহাকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিতেন—আল্লার নাম করো হোসেন। আল্লার নাম করো—দুঃখের রাত্রি পোহাইবেই।

সে সান্ত্বনা কি সত্য?

ভিতরে বাহিরের ঐ গাঢ় অন্ধকার কি এখনও শেষপ্রহরে পৌঁছে নাই? ক্ষেতে ধানের গোছা অনেক সোনালি স্বপন বুকে লইয়া সহস্র নিবেদিতার মতো নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শ্বশুরের ক্ষেতের মাঝেকার সেই নালাটা দিয়া হয়তো কইমাছের সারি কানকো ঘষিয়া খালে নামিয়া যাইতেছে। আর এদিকে উঠানের পাশে কুলতলার নালায় পাতা তাহার ‘চাঁই’এর দিকে কেহ আগাইয়া যাইতেছে।

ফিস ফিস করিয়া হোসেন কি বলিয়া উঠিল—ঘরের দিকে অগ্রসরমান ছায়াগুলি সরিয়া গেল—না উহারা মানুষ নয়। শেয়াল। হোসেন ভুল করিয়াছে।

গায়ের গোটাগুলি অল্প অল্প চুলকাইবার ইচ্ছা হইতেছে।

তন্দ্রায় সে স্বপ্ন দেখিল—উঠনের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জ্যোতির্ময় পুরুষ হয়তো বা আকাশ হইতে নামিয়াই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আবক্ষলম্বিত তাহার শুভ্র শ্মশ্রু। সমস্ত দেহে শুভ্র বেশ—বাঁহাতে তসবিহ। শান্ত সৌম্য হাসিভরা মুখের দুইটি রক্তিম ঠোঁট সান্ত্বনার বাণীতে কাঁপিয়া উঠিতেছে। শীর্ণ চক্ষু দুটিতে মমতার অন্ত নাই। কাছে আসিয়া ডানহাতে কি পানীয় তিনি হোসেনের ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিলেন, তাহা পান করিয়া হোসেনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। জ্যোতির্ময় পুরুষ সমস্ত দেহে কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দিলেন। আরো কাছে আসিয়া হোসেনের মস্তক নিজ ক্রোড়ে লইয়া তাহার নিকটে বসিলেন। হোসেন চিনিতে পারিল—হাজী সাহেব। আকুল হইয়া সে তাহার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—হাজী সাহেব স্মিতমুখে যেন বহুদূর ঐ আকাশের তারকাদের মতো কোনো সুদূর হইতে বলিলেন, আল্লার নাম করো, সমস্ত বিপদ মসিবত দূর হইয়া যাইবে। নয়া জমানার প্রভাতের বিলম্ব নাই। তাহার কণ্ঠ যেন সেই প্রভাতের বন্দনায় মুখর হইয়া উঠিল। তাহারই তপস্যায় তিনি নিমজ্জিত হইয়া গেছেন আর হোসেন সুদূরে চাহিয়া দেখিতেছে পূর্বাচলে আকাশ বাতাস মাটি রামধনুর চাইতেও বিচিত্র পবিত্র রঙে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। কোনো শুভ্র শান্ত পবিত্র জ্যোতির আগমন বার্তা লইয়া অজস্র হুরপরী জিন ফেরেশতারা অপূর্ব সংগীতে বন্দনা

গাহিয়া মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছেন। হাজী সাহেবের কণ্ঠ তাদের গীতের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। সকলেরই চক্ষু যেন তাহারই মতো হতভাগ্যের প্রতি নিবদ্ধ।

বাহিরে তখন ধীরে ধীরে রাত্রির তমিস্রা অপসারিত হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু সে আর চক্ষু মেলিয়া দৈনন্দিন সূর্য দেখিল না। পরদিন ভোরে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আজাহার রাবেয়াকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া দেখিল, হোসেনের মৃতদেহের অধিকাংশই যেন কিসে খাইয়া ফেলিয়াছে কিন্তু তবু চক্ষু দুটির পরম আশ্বাসময় দৃষ্টি তখনো সম্মুখে নিবদ্ধ। আজাহার শিহরিয়া আগাইয়া আসিয়া পক্ষে পক্ষ মিশাইয়া দিল।

# মূলধন

ক্ষেত ছেড়ে লাঙল কাঁধে বাড়ি যাচ্ছিল মেনাজ। খালের পাড়ে পাড়ে ছোট্ট পথ। তারপর হাটখোলা। সেখানে বৈরাগীর দোকানের সামনে বৈরাগীর সাজানো কলকেটায় একটা টান দেবার জন্য থামতেই, সামনে তাকিয়ে দেখে প্যাচপেচে কাদার মধ্যে মনু হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, মুখ থুবড়ে।

তামাক খাওয়া মাথায় রইল; তাড়াতাড়ি ছুটল তার পিছনে।

—এই ওঠ, এইতো—ওঠ—বহু টানা হেঁচড়া করে মেনাজ তাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে।

বৈরাগী ডেকে বলে—আসবো নাকি ?

সমস্তটুকু জোর দিয়ে তাকে টেনে দাঁড় করাতে করাতে মেনাজ বলে—না, না। এইতো উঠেছে। মনু তো আমার বুড়ি নয় যে এই কাদা থেকে ও উঠতে পারবে না।

তারপর অপেক্ষাকৃত একটু শক্ত মাটিতে টেনে নিয়ে মনুর মুখের কাদা মুছিয়ে দেয়। একটু আদর করে দুয়েকটা কী কথা বলে। মনু নিঃশব্দে একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তারপর মাথাটা ঘেঁষে আসে পাঁজরের দিকে।

—ওকী মেনাজ এখনো দাঁড়িয়ে ! বাড়ি যাবে না ?

খালের ওপার থেকে করমালী হাঁক দেয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ যাবো। একটু কাল সবুর করেন দাদা। দেখছেন তো কাদা মেখে কেমন হয়েছে মনু ! একটু ধুইয়ে নিই—

বলতে বলতে মন্নুকে টেনে খালে নামে মেনাজ। মন্নুর সারা গা রগড়ে রগড়ে ভালো করে ধুয়ে দেয়।

আশ্চর্য রকম সুন্দর মন্নুর নধর দেহটি। এমন তেলালো খয়েরী রঙ আর কালো গায়ে নেই সারা নাচনমহলে। এমন গরু নিয়ে আর ঈর্ষাও কুড়োয় না কেউ। মেনাজ আস্তে আস্তে ঘসে ঘসে সব কাদা তুলে ফেলে তার গা থেকে। মুখে আবার পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির হাসি ফিরে আসে।

করমালী ওধারে স্মিতমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম সুবাদে মেনাজ তাকে দাদা ডাকে। অনেকদিন থেকেই তার সুখে-দুঃখের বন্ধু। অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী। তার শাদাপাকা দাড়ির মধ্যে হাসিটুকু যেমন শ্রান্তিকরুণ তেমনি স্নেহময় বলে মনে হয় মেনাজের। তাছাড়া অনেকদিন পরে তার মুখে হাসি দেখে সে খুশি হয়ে বলে—কী দাদা হাসছেন যে?

—দেখছি বাপ ব্যাটার কাণ্ড!

মেনাজ লজ্জা পায়—দূর, আপনার কেবল,—চলেন, চলেন এখন।

তাড়া না দিয়ে পারে না মেনাজ। অথচ আবার ভালোও লাগে। এরকম রসিকতা কেবল দাদা নয়, সারা গ্রামের লোকেও করে। করমালীর তবু দরদ আছে। যাদের নেই তাদের কথায় সে সত্যি দুঃখ পায়। ওরা বোঝে না মন্নু শুধু গরুই নয়। বাস্তবিক মানুষের মতো অনুভূতি আছে তার। সব বোঝে ও। আদর করে ঘাস বিচালি খেতে দিও, দেখো, কালো চোখ দুটি তুলে কী নিবিড় কৃতজ্ঞতাই না তোমাকে জানাবে। চড় চাপড় দিয়ে দেখো পাঁজরের চামড়াটা বেদনায় কেমন থরথর করে কাঁপে; সমস্ত মুখে কালো ছায়া নামে; দুঃখে আর ভয়ে ও কী আর তোমার দিকে তাকাবে ভেবেছো?

ওপরে উঠে বাহাতে কাঁধের লাঙল চেপে অন্যহাত মনুর ঘাড়ে রেখে কথা বলতে বলতে বাড়ির পথ ধরল তারা।

তারপর একটা সাঁকো পার হয়ে দুজন দুপথ ধরে। মেনাজ মুখে শব্দ করে মনুকে তাড়াতাড়ি চলতে উৎসাহ দেয়। ঐ তো বাড়ি। 'বিল' থেকে তাজা ঘাস কেটে এনে রেখেছি। পেট পুরে খেও।

মরিচ ক্ষেতের পাশ দিয়ে বাড়ির দরজায় পড়ার মুখে, মনুকে থামিয়ে মেনাজ একবার চারদিকটা দেখে নিল কেউ আছে কিনা! তারপর মাথায় বাঁধা গামছা খুলে আস্তে আস্তে তার সারা গা মুছিয়ে দিল।

চৌ-চালা টিনের ঘরের পেছনে গোয়াল ঘর। মনুকে দেখে বাছুরটার সে কী লাফালাফি। ডাকাডাকি। দড়ি খুলে দিতেই ছুটে এসে দুধের বাঁটে চুমুক লাগায়। মেনাজ মনুর গলার দড়িটা খুঁটিতে বেঁধে স্তূপকরা কাঁচা ঘাস এক খামচা তুলে মাটির গামলার মধ্যে রাখে। এক কলসী জল এনে ঢালে।

—নে এবার খা।—গলায় কয়েকটা আদরের চাপড় দিয়ে মেনাজ তারপর বেরিয়ে আসে।

বাংলার শস্যভাণ্ডারের চাষী বটে মেনাজ, কিন্তু নিজে সে এক রকম ভূমিহীন কিসান। এরা পরের ক্ষেতে বর্গা খেটে রুজি রোজগার করে। এদের মত কাদা জলে জোঁকের কামড় নিয়ে এত শস্যও বোধ হয় কেউ ফলায় না, তবু অভাব বর্তমান পুরোমাত্রায়। সর্বোপরি তো এরা সংগ্রাম করে—বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে।—হয় প্রচণ্ড বন্যা ধানের খাড়া খাড়া সোনালি শীষগুলো মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যায়, অথবা ক্ষেত থেকে ঘরে না উঠতেই মামলা-মোকদ্দমা জমিদারের খাজনা প্রভৃতির শেষে হাতে

জমা থাকে অতি অল্পই। তা দিয়ে কোনোমতে দিন কাটে। তেরোশো পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর মহামারীতে এদের মাঝে তো হাহাকার। ধারকর্জ দেনা করে মন্বন্তর থেকে যারা বাঁচল, তাদের অধিকাংশ আবার নিশ্চিন্ত হোলো মহামারীতে। ধরা যাক না ঐ করমালীর কথা, তালুকদার রহম মিঞার কর্জ কৃপায় যদি বা মন্বন্তর থেকে বাঁচল, কিন্তু সমস্ত ঘরটা খা খা হয়ে গেল বসন্তে। যে করমালী একদা ছিল গ্রামের বয়োবৃদ্ধ 'দাদা' আনন্দের খনি, সে-ও যেন এবার কেমন নিঃঝুম হয়ে পড়েছে। বুড়োবয়সে লাঙল কাঁধে ক্ষেতে নামতে বাধ্য হয়েছে আবার।

মেনাজের বরাত ভালো। জমি মাত্র 'দুকুড়া' হলেও তার ফসলে ছোট পরিবারটি ধাক্কাটা উৎরে উঠেছে। রোগেও কেউ পড়েনি। কিন্তু গত ভাদ্রে চাষের গরুটা মারা গেল। নতুন একটা কিনে এনে জুড়বে, তা আগুন হয়ে উঠল দাম। গাই গরুটা ছিল বলে রক্ষা। আশ্বিনের শেষের দিকে দুবেলা দুমুঠো জোটাতেই যখন প্রাণান্ত অবস্থা, সে সময় দৈনিক দেড়সের দুধ দিয়ে ঐ গাইটাই তাদের বাঁচিয়েছিল—আদর করে মেনাজ যার নাম দিয়েছে মনু। ওরি কল্যাণে কিছু তবু খেতে মিলেছিল, তা নাহলে বহুজনের মতো তাকেও শহরের পথে বেরিয়ে পড়তে হোতো দুমুঠো খাবার খুঁটে বাঁচতে।

এবার একটা গরু কেনা তার আর সাধ্যে কুলোয়নি। একেতো গতোবারের মড়কে দিকবিদিকের গরু মারা গেছে। তার ওপর মিলিটারী কনট্রাকটর চড়া দামে গরু কেনে, যার ফলে দেড়শো দুশো টাকার কমে কোনো ভালো গরু কেনার কথা কল্পনাতেও আসে না। বাধ্য হয়ে মনুকে দিয়েই কাজ চালাতে

হচ্ছে। আরেকটা ধার নেয় মাঝে মাঝে করমালীর কাছ থেকে। তারো সাত কুড়া জমি সে 'বদলা' দিয়ে চষে দিচ্ছে। ছোটো সংসারটি নিয়ে তার দিন মোটামুটি চলছে একরকম। থাকলই বা না হয় এখন অভাব-অনটন, ভাবে, মনুকে দিয়ে সে বরাত ফিরিয়ে নেবে তার, যাক না কিছুটা দিন।

আষাঢ়ের শেষ দিকে গোমড়ক লেগেছে শুনে সারা গ্রামের চাষীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড বাহাদুরপুর মৌজা নাকি টপাটপ উজার হয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে সবাই স্থির। গতোবার মড়কের সময় তবু ইউনিয়ন বোর্ড থেকে শহরের পশুডাক্তার আনিয়ে টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু এবার তারা নীরব। প্রেসিডেন্ট বলছেন, ডাক্তার আসছে। তবু কোথায় কে? দেখতে দেখতে মেনাজের গ্রামেও এল। মারা পড়ল করমালীরও একটা।

তিনটা গরু তার গোয়ালে। প্রথমটার তিনদিনের মধ্যে আক্রান্ত হোলো আরো একটা। দুর্ভাগ্যের দুশ্চিন্তায় তখন আর প্রাণ নেই যেন করমালীর। চাষ বন্ধ। গোয়ালঘরের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সে নিঃঝুম হয়ে বসে থাকে।

মেনাজ এসে গরু দুটোকে দেখে। তাদের চামড়ার নিচে গুটি গুটি মাংসের গোলক উঁচু হয়ে উঠেছে। একটা পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক একবার থরথর করে কেঁপে কেঁপে পা সিধে করে দেয়, আবার সমস্ত দেহটা শুদ্ধ ছটফটিয়ে গড়াগড়ি যায়। চোখে জল; মুখে ফেনা, লালার স্রোত। মাছি আর পাতলা গোবর।

অন্য একটা অবিচল। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। অর্ধোন্মিলীত

চোখে সে কিছু দেখছে কী দেখছে না বোঝা যায় না। তার মুখে লালা, ফেনা। চোখে জল। মাছি আর পাতলা গোবর।

গঙিয়ে অন্যটা কাতর আর্তনাদ করে—হাম্বোয়াঁ-য়াঁ—

চারটে পা সিধে করে ছড়িয়ে দিল চারপাশে, মোটা ঠোঁট দুটোও খিঁচড়ে বিকৃত হয়ে গেল। চোখ উল্টালে। তারপর আরএকবার আর্তনাদ করে ওঠে। এবার আওয়াজ ক্ষীণ।

অন্য গরুটা একবার তার দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার ঝিমায়।

পাতলা বিবর্ণ গোবরে গোয়ালে কোথাও পা ফেলারও স্থান নেই।

আর্তনাদ করে গরুটা আরেকবার মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পা ছুঁড়ে ঝিমিয়ে বাতি নেভার মতো নিঃশেষ হয়ে গেল।

করমালীর দিকে আর তাকানো যায় না তখন। কোনো চাঞ্চল্য নেই তার। স্থির। শাদা দাড়ি গোঁফ চুলের মাঝখানে দুটি ক্ষীণদৃষ্টি নিষ্প্রভ চোখের কোণ বেয়ে অবিরল ধারাস্রোত। নাকের ডগাটা ফুলে ফুলে উঠছে বারবার। দাড়ি গোঁফের অন্তরালে ঠোঁট দুটি কতো কাঁপছে।

তাকে কী সান্ত্বনা দেবে মেনাজ। সেও স্তব্ধ হয়ে মৃত গরুটির দিকে তাকিয়ে রইল। বাহাদুরপুর উজার হয়ে গেছে, সুবিদপুরে হাহাকার। তাদের শুরু। করমালীর দুটো মরেছে, ঐটাও মরবে। ধীরে ধীরে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে অবোধ পশুদের ঐ সর্বনাশা চিকিৎসাহীন রোগ!

সহসা যেন চমকে উঠল মেনাজ। করমালিকে কিছু না বলেই হঠাৎ বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে মনু। বাছুরটা নিয়ে তারই মতো আদর করে

খেলা করছে তার পাঁচবছরের ছেলে রহমান। মেনাজকে দেখে সে ছুটে এল—দেখো, আমার গা চেটে দিতে চাইছে ও।

বাছুরটাও যেন মজা করে তার গা শুকছে। মেনাজের মুখের ম্লান আভা উড়ে যায়। মনুর কাছে বসে ছেলেমানুষের মতো কথা বলে—পেটভরে খেয়েছিস্ তো মনু? কালকে আরো তাজা ঘাস কেটে আনব'খন······হ্যাঁরে শুনেছিস গ্রামে ব্যারাম শুরু হয়েছে। সাবধানে থাকতে হবে তোমার। শহর থেকে ডাক্তার আসছে। টিকা নিতে ভয় পাবিনে তো আবার? কিছু ব্যথা নেই; বুঝেছিস? মনুর শিঙের সঙ্গে গাল ঠেসে বলে যাচ্ছিল মেনাজ, হঠাৎ একটা পায়ের দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, এযাঃ!

রহমান জিজ্ঞাসা করলে—কী বাজান?

—জোঁক।

খুরের মাঝে লম্বালম্বি চুমুক লাগিয়ে রয়েছে একটা ছিনে জোঁক। রক্ত খেয়ে ফুলে উঠেছে। হাত দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে এনে কাছের পুকুরটার মাঝে ফেলে দিল।

—ইস্‌স্ হারামজাদা শত্তুরে অনেকখানি রক্ত খেয়ে ফেলেছে নারে মনু? মনুর মাথায় আদর করে হাত বুলায় মেনাজ।—ভাবিসনি ভালো করে খেলে ওটুকু রক্ত হতে আবার কতদিন! মেনাজ বিড়বিড় করে অনেক কথা বলে যায়। মনু নীরবে তার হাঁটুর সঙ্গে মুখ ঘসে।

—সমস্তদিনই কী মনু মনু করবে, আজ নাওয়া-খাওয়া লাগবে না? হুঁকোহাতে করে মেনাজকে তাড়া দেয় রাবেয়া—কী যে শিশুর মতো তোমার বাতিক!

গরুর গলা ছেড়ে মেনাজ লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। হুঁকোটা

হাতে নিয়ে গোটা দুই টান দিয়ে বলে—বাতিক! মনু যে আমাদের কী ধন তা বুঝিস বউ।

তার ঠাণ্ডাস্বরে রাবেয়া পরিহাসের শক্তি হারায়। খানিক পরে বলে—দাদার গরু দুটো কেমন হয়েছে?

মেনাজের হুঁকাটানা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চোখে আবার কী ভীতি ফুটে ওঠে! একবার মনুর দিকে তাকিয়ে রাবেয়াকে প্রায় ঠেলেই সে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এল—আস্তে, এসব কথা ওকে শুনিও না কিন্তু।

—কেন? রাবেয়া অবাক হয়।

—কেন! কেন কী! বলে রাখলাম, ওর সামনে আর কখনও ঐ রোগের নাম নিও না। মেনাজ তর্জন করে ওঠে।

—বাঃ, আমি নিয়েছি নাকি!

তবু তর্ক করে! ধৈর্য হারিয়ে সত্যি সত্যি রেগে রাবেয়াকে একটা গাল দিয়ে ওঠে মেনাজ।

রাবেয়া অবাক হয়! আশ্চর্য লাগে। অনেকদিন পরে মেনাজের খামোকা গাল খেয়ে অভিমানে চোখে জল আসে। রাগও হয়। আর কোনো কিছু না বলে সোজাসুজি ঘরে চলে যায়।

হঠাৎ রাগ করে পরক্ষণেই মেনাজ বুঝতে পারে কাজটা ভালো হয়নি। আড়চোখে রাবেয়ার গমনপথের দিকে তাকায়। অত্যন্ত শক্ত রাগ রাবেয়ার। ফলও বিষম। ইতিপূর্বে কয়েকবার তার আস্বাদ জানা আছে তার। কিন্তু ও বোঝেই বা না কেন? ঐ রোগের আলোচনা মনুর কাছে বসে করলে, খোদা না করুন যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে তার? বেশ করেছে, থাক। আক্কেল হোক। জীবনদাত্রী মনু যে তাদের কতোবড়ো অবলম্বন, তার কোনো অমঙ্গল

ঘটলে তাদের যে কি অবস্থা ঘটবে, তা কি উপলব্ধির মধ্যে আছে ওর?

কিন্তু তবু খানিক পরে গুটি গুটি তার কাছে যেয়ে হাজির হয়।

রাবেয়া তখন কি কাজে ব্যস্ত। মেনাজের মতলব বুঝে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। সে আর কোনো কথা বলার সুযোগ পায় না।

সুতরাং বাধ্য হয়ে এক সময় ডেকেই ফেলে—শোনো বউ।

রাবেয়া গ্রাহ্য না করে অন্যত্র উঠে যায়।

অবশেষে রহমানকে যখন স্নান করায় রাবেয়া, তখন কাছে যেয়ে বসে।—হঠাৎ কি বলে ফেলেছি, রাগ করিসনে।

রাবেয়া কথা বলে না। মেনাজ খানিক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বলে—বিকেলে একটা মুরগী জবাই করে দুটো ভাত রাঁধ বউ। মিলাদ পড়াব।

—আমি পারব না।

রাবেয়া ঝংকার দিয়ে ওঠে।

—দোহাই রাবু রাগ করিসনে! রাগের মাথায় কী বলেছি, কিছু মনে রাখিসনে। এই তোর হাত ধরছি—

রাবেয়া এক ঝটকায় হাত ছড়িয়ে নেয়।—বিরক্ত কোরো না আমাকে। এখন আর গায়ে পড়ে আদর করতে হবে না।—একটু থেমে বললে—ঘাট নেই কসুর নেই খামোকা তুমি বাপ তুলে গাল দিলে, এ নীরবে হজম করব না, এমন মেয়ে আমি নই!

মেনাজও একটু উষ্মার সঙ্গে বললে—বললাম যে রাগের মাথায় বলে ফেলেছি! মনু যে—

—আমাকে বিরক্ত কোরো না। মিলাদ পড়াবে পড়িও, আমি দেবখন রেঁধে, বাঁদি যখন রেখেছ।

মেনাজ বিরক্ত হোলো। রাগও হোলো খানিকটা। কিন্তু আবার রাগলে হিতে বিপরীত হয়ে না যায় ভেবে সামলে নিল। তখনকার মতো হাল ছেড়ে হুঁকো রেখে স্নান করতে গেল।

যাবার সময় গম্ভীর কণ্ঠে বলে গেল—স্বামী হয়ে মাপ চাইলাম তাতেও যদি তোমার না হয়ে থাকে তবে তো আমি নাচার।

একে মনে দুশ্চিন্তা, তার উপর এই তুচ্ছ বিষয়টা নিয়ে এই কষাকষি অত্যন্ত বিশ্রী লাগছিল তার। না হয় রাগের মাথায় বাপকে উল্লেখ করে একটা খারাপ কথা বলেই ফেলেছি কিন্তু তার জন্য এতো করেও বা তার মান ভাঙবে না, এ অসহ্য।

কিন্তু বিকেলে দেখা গেল রাবেয়া খাবার দাবার তৈরী করে মিলাদের আয়োজনে ব্যস্ত। কেবল রোজকার মতো তার মুখে হাসি গল্প কথা নেই। মেনাজ ভাবল, যাক নরম হয়েছে যখন, মিলাদের পরে রাত্রে আর একবার মান ভাঙাবার চেষ্টা করা যাবে।

ইয়া নবী সালাম আলাইকা—

কয়েকজন বন্ধু মুরুব্বি নিয়ে মৌলবীর সঙ্গে কণ্ঠে পরিপূর্ণ জোর আর অসীম ভরসা নিয়ে প্রত্যেকটি পদ আবৃত্তি করে মিলাদ পড়ল মেনাজ। যেন মনুর শুভাশুভ ভবিষ্যৎ এই অনুষ্ঠানেরই ওপর নির্ভরশীল। মনে মনে আবার সতর্কতাও, পাছে তার অন্তরের এই গোপন কামনা জেনে কেউ পরিহাস না করে।

মনু তার জীবন। তার জীবনের একমাত্র মূলধন। অন্তরতম তার মূল্য। মোনাজাতের সময় আকুল অন্তরে সে খোদার কাছে তার মঙ্গলের প্রার্থনা জানাল—মনুকে তুমি আপদ বিপদ থেকে

রক্ষা কোরো খোদা। মনু আমার সুস্থ থাকুক। এই ছোঁয়াচে ব্যাধির সংক্রমণ থেকে তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখো আল্লাহ।

রাত্রে সত্যি রাগের শেষ হয়ে গেল রাবেয়ার। বললে, কিন্তু ভেবে আশ্চর্য হই, যা কোনোদিন তোমার মুখ থেকে শুনিনি, হঠাৎ তাই বলে ফেললে, এতো বদ মেজাজ তো কোনোকালে তোমার ছিল না! মেনাজ বললে, মনে বড়ো দুশ্চিন্তা রাবু। বড় অস্থির আছি!

পরপর কয় দিনে গ্রামের এতোগুলো গরু মারা পড়ল যে অনেকেরই গোয়াল শূন্য হয়ে গেল। ভিটায়, মাঠে খালের পাশে পাশে ভিড় করল মৃতদেহলোলুপ শকুন-কুকুর। পথে দেখা যেতে লাগল গ্রাম্য গরু চিকিৎসক গোয়ালের আনাগোনা। অথচ এ ব্যাধির আর চিকিৎসা নেই। প্রথম প্রথম গরুগুলো মাথা ঝুকিয়ে নিঃঝুম হয়ে বসে থাকে, মুখে ফেনা গড়ায়, খায় না কিছু। শেষে সারা গায়ে গুটি জাগে, পাকে। তারপর ছটফট করে নিথর হয় শেষ হয়। গোয়ালের কালো কালো বড়ো বড়িগুলোতে কোনো কাজই হয় না।

শহরের ডাক্তারের তখনো দেখা নেই।

করমালীর গোয়াল তখন একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। সমস্ত দিন মরার মত দাওয়ার ওপর শুয়ে থাকে।

মেনাজের চাষ বন্ধ। মনুকে নিয়ে ক্ষেতে যাবার সাহস পায় না। গোয়ালের কাছে পরামর্শ নিয়ে মনুকে সাবধানে রাখতে কসুর করেনি সে। তবু আশঙ্কায় মনে স্বস্তি নেই। একদিন বাড়ি ফিরে দেখে গোয়াল শূন্য। মনু নেই। খোঁজ খোঁজ। চারিদিকে ব্যারামের ধুম, এরমাঝে কে খুলে দিল? কোন শত্তুরের কাজ? মেনাজ তো পাগল প্রায়। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তাকে পাওয়া গেল বাড়ির

পিছনের একটা ভিটায়। সেখানে হাঁটু সমান জল। তাতে নেমে সে পরমানন্দে সবুজ ধানের শীষ চিবুচ্ছে। ক্ষেত মল্লিকদের, ভাগ্যিস তারা কেউ দেখেনি, নইলে হয়তো তখুনি একটা বিবাদ বেধে উঠত।

শাপ দেবে যে পোড়া কপালি! ঘরে এতো তাজা ঘাস উজার করা থাকতেও বীজধান খেতে এলি কেন?—রাগে দুঃখে দাঁত কিড়মিড় করে মন্নুর পিঠে কয়েকটা চাপড় লাগাল মেনাজ।

আহত স্থানটা থরথর করে কেঁপে উঠল মন্নুর। চোয়াল নাড়া বন্ধ করে সে তাকাল মেনাজের দিকে।

তার সে চাহনি দেখে কোথায় গেল মেনাজের রাগ! মুখে গাম্ভীর্য টেনে তাড়াতাড়ি বললে—চল, চল শীগ্‌গির।

গোয়াল পর্যন্ত যেতেযেতেই অনুতাপ প্রকাশ পায় তার আদরের ভাষায়। আহতস্থানে হাত বুলিয়ে বলে, খুব লেগেছে নয় মন্নু, অ্যাঁ? তা তুই ওখানে গেলি কেন বল? কে খুলে দিয়েছিল তোকে?

মন্নুকে পাওয়া গেছে দেখে হাততালি দিয়ে ছুটে এসেছিল রহমান, বললে, আমি দড়ি খুলে দিয়েছি বাজান।

—তাই বলো! শোনো এদিকে—কঠিনস্বরে মেনাজ তাকে কাছে ডাকে। ভীত ছেলেটার কান ধরে গালে সে এক প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দিল—হারামজাদা, আর কোনোদিন খুলে দিবি তো মেরে ফেলবো তোকে।—কান্নার শব্দে রাবেয়া ছুটে এল। কী হোলো?

সব শুনে ছেলেকে নিয়ে যেতে যেতে বললে, ছেলেমানুষ। তার এইতো অপরাধ। তার জন্য এমন চড় দিলে, দেখ দিকি পাঁচটা আঙুল গালে কেমন দাগ কেটে বসে গেছে!

মেনাজের দেখার প্রয়োজন বোধ হোলো না, বললে, বেশ করেছি। যাও, বকবক কোরো না। রাবেয়া মেনাজকে অনুসন্ধিৎসু চোখে একটু

পর্যবেক্ষণ করে বললে, তোমার হোলো কী আজকাল? মন্নু মন্নু করে যে ক্ষেপে উঠলে! মানুষদেরও একটু খেয়াল কোরো!

গ্রামে ক্রমে এমন অবস্থা হোলো যে গরু যে কয়টা আছে তা আঙুলে গোনা যায়। এর মাঝে করমালী পড়ল খুব শক্ত অসুখে, একেবারে এখন-তখন অবস্থা। কবিরাজ বললে শহরের হাসপাতাল ছাড়া চিকিৎসা নেই। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি কেউ নিয়ে যাও।

তার পুত্রবধূ ধরে পড়ল মেনাজকে। অনুনয় আর ক্রন্দনের তুফান তুলল সে, অগত্যা বাধ্য হয়ে রওনা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না মেনাজের। কথা হোলো যে শুধুমাত্র তাদের পৌঁছে দিলেই হবে। করমালীর পুত্রবধূর এক দূর সম্পর্কের ভাই আছে সেখানে রিক্সা চালায়, তাকে দিয়ে বাকি সব কাজ করাবে।

যাবার সময় মন্নুর কাছে বিদায় নিয়ে রাবেয়াকে বার বার বলে গেল খবরদার খেয়াল রেখো মন্নুর দিকে। ছেড়ে দিও না কোথাও। ঘাস কেটে রেখে যাচ্ছি। সময়মতো ঘাস পানিটা দিও।

ওদের পৌঁছে দিয়ে পরদিনই রওনা হয়ে এল মেনাজ।

বাড়ি ঢুকে প্রথমেই উঠল গোয়ালে।

কিন্তু সেখানে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী চেহারা হয়েছে মন্নুর এই দুদিনেই! অনেক যেন শুকিয়ে গেছে সে, মুখের কাছে নেই একটি ছড়া সবুজ ঘাস। নিথরভাবে নিচে তাকিয়ে সে ধুঁকছে। বাছুরটা নির্জীবভাবে খুঁটির গোড়ায় শোয়া।

মন্নু মেনাজের দিকে একবার তাকাল না। রাবেয়া কী এই যত্ন নিয়েছে তার? সামনের গামলাটা একেবারে খালি। হয়তো রাবেয়া

তাকে খেতেও দেয়নি মনে করে। নিজে গিলতে হয়তো নিশ্চয় ভুল করেনি। আর স্নানও কি করান হয়েছে একদিনও? তাহলে কি এই চেহারা হয়? রাবেয়ার উপর ক্রোধে মেনাজের মুখ কঠিন হয়ে এল।

তাকে দেখে ছেলেটা আনন্দ করে ছুটে এল—বাজান এসেছে। বাজান এসেছে! মেনাজ এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে সোজাসুজি রাবেয়ার সামনে গিয়ে উপস্থিত হোলো—এই যত্ন করেছ তুমি মনুকে? স্নান করাওনি, ঘাস দাওনি—নিজে গিলতে তো নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।

রাগে কাঁপতে লাগল মেনাজ। কথা জড়িয়ে গেল। যে রকম ভাব চতুর্দিকে, একটু অবহেলা অযত্নে কী না হয়ে যেতে পারে!

আহাম্মক হারামজাদী! এমনি করে যে কতবড় সর্বনাশ ঘটতে পারে খেয়াল আছে তোর? জানিস—

অনেকক্ষণ অবিশ্রান্ত বকে গেল মেনাজ। এত রাগ, এত গালাগাল আজ দীর্ঘ ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে কখনো দেখেনি রাবেয়া। একদিকে যেমন ক্ষোভে রাগে বুক ভরে ওঠে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যও লাগে মেনাজের এ হোলো কী! ঘাস পানি কি দেয়নি সে, আজ না হয় দিতে একটু বেলাই হয়েছে, তা বলে শান্তস্বভাবের মেনাজের এ কী মূর্তি!

একসময় না বলে পারল না, দেখ, ওরকম গালাগাল দিও না। এতদিন তোমার ঘর করেছি এমন কথা তোমার মুখে তো শুনিনি!

—না শুনেছ এবার শোন। শোনা তোমার উচিত।

—বিনা দোষে কেন শুনব? দেখ, তোমার মেজাজ দিনদিন খারাপ হচ্ছে, আমরা যেন তোমার শত্তুর হয়ে পড়েছি। তা সত্যিই যদি তোমার কোনো অসুবিধে হয় তাহলে আমি বাপের বাড়ি যেয়ে থাকছি।

যাও না, ধরে রাখছে কে ?

যাব ? তুমি তাহলে ঠাণ্ডা হবে ?

রাগের ঝোঁকে মেনাজ বলে ফেলল, হ্যাঁ হ্যাঁ যাও, খুব ঠাণ্ডা হব। বাঁচব। আমার দরদ যে বুঝবে না, রাত দিন তার সঙ্গে এমন ঝগড়াঝাঁটি করতে পারব না।

বেশ !

মেনাজ আর কোনোদিক খেয়াল করে না। চালে গোঁজা কাস্তেখানা নিয়ে ঘাস কাটতে বেরিয়ে যায়।

মনটা তিক্ত হয়ে ওঠে। সাতবছর আগে পিতৃমাতৃপরিজনহীন হয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় মেনাজ নিজের ভাগ্য গড়তে শুরু করেছিল। আর এই গড়ার সবচেয়ে বড় মূলধন তার মনু আর রাবেয়ার অবিমিশ্র ভালোবাসা। এতকালের সে ভালোবাসায় কোথাও এতটুকু চিড় ধরেনি। হয়নি কোনো দুর্দাম ঝগড়াঝাঁটি ! ঘটেনি মনান্তর। কিন্তু আজ এ কী ! রাবেয়ার সেই সহানুভূতি দরদ কোথায় গেল ? সামান্য সামান্য কথায় এত অনর্থ ঘটে কেন ?

ঘাস কেটে ফিরে দেখে, পাশের বাড়ির আসগরকে ডেকে সত্যি সত্যি বাপের বাড়ি চলেছে রাবেয়া। মেনাজ কিছু না বলে গোয়াল ঘরে চলে আসে।

কিন্তু সে ঘাস স্পর্শও করে না মনু। মুখ ফিরিয়ে নেয়। কত সাধাসাধি করল—ফেলে গেছলাম বলে আমার ওপর রাগ করেছিস মনু ? আর যাব না, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি আর কখন যাব না। তুই খা মনু, খা।

কিন্তু তবু মনু খায় না।

পাশেই খাল। দেখা গেল রাবেয়া নৌকোয় উঠছে।

মেনাজ ভাবে সত্যি সত্যিই সে যাচ্ছে নাকি?

ঘাস ফেলে সে নৌকোর কাছে এল—না বলেই যাচ্ছো নাকি?

—বলব কী আর? হ্যাঁ যাচ্ছি, ভাইয়ের অসুখ শুনেছি। তাকেও দেখে আসব। তুমিও ঠাণ্ডা হও। থাকো তোমার মনুকে নিয়ে।

মেনাজ কি করবে ভেবে পায় না। থাকো তোমার মনুকে নিয়ে। থাকবে বই কি! জীবনের মূলধনকে ত্যাগ করবে কি করে! কিন্তু শুধু তাইতো নয়, রাবেয়ার ভালোবাসাও তো তার বন্ধুর জীবনপথের পাথেয়। অপরাধ করেও, অনুতপ্ত না হয়ে উল্টে রাবেয়া সেই পাথেয় থেকেই বঞ্চিত করতে যাচ্ছে তাকে!

—না, তুমি যেতে পারবে না। উঠে এস—

—আমি যাবই। একবার যখন যেতে বলেছ যাবই, আমি গেলে নাকি বাঁচবে, বাঁচ এবার। যদি দরকার মনে হয় কোনোদিন সেদিন নিয়ে এস। চল আসগর।

পিছনে মনুর চিৎকার শোনা যায়—হাম্বোয়া-য়া—

রাগে দিশে হারাল মেনাজ; চিৎকার করে বলল, আমার নিষেধ না শুনে যদি যাও তবে আর কোনোদিন আমার দরকার হবে না। এই যাওয়ার জন্য তখন অনুতাপ করবে বলে রাখলাম।

রাবেয়ার নৌকো তখন চলতে শুরু করেছে। মেনাজ আরো কি বলতে গিয়ে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারে না; রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে মনুকে আবার খাওয়াতে যায় মেনাজ। সাধাসাধি ছেড়ে রাগ করে। বকে ঝকে মেরে খাওয়াতে যায়।

মনু এবার তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। মেনাজ এতক্ষণে

লক্ষ্য করে তার চোখ ঘোলাটে, মুখে ফেনা আর পাতলা গোবরে গোয়াল আকীর্ণ।

মেনাজের বুকে যেন দমাদম হাতুড়ি পড়ে। ভালো করে মনুকে পর্যবেক্ষণ করে। মনে হয় যেন মাথা ঘুরছে। পাগলের মত সে মনুর সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করে।

ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে, শরীর খারাপ হয়েছে তোর মনু, অ্যাঁ? ওরে বল না?

মনু নিথর। বাছুরটা চেঁচিয়ে ওঠে।

মেনাজ ভেবে পায় না কী তার করা উচিত। অজানা আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে চলল গোয়ালের বাড়ি।

গোয়াল বললে, যাওয়ার আর দরকার কি! লক্ষণ মিলে যাচ্ছে! ব্যারাম যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বড়ি নিয়ে যাও, যদি রাখার হয়, তো ওতেই হবে।

মেনাজ টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। দূর থেকে মনুর আর্তনাদ কানে যায়। এমনি সে ডেকে উঠেছিল সেদিন কাদায় পড়ে। ও আর্তনাদ নয়, মেনাজকে ডাকা। দুহাতে বুক চেপে সে গোয়ালের কাছে এসে দাঁড়ায়। কলাপাতা ঝুলিয়ে বেড়া-দেওয়া গোয়ালের বাইরে দুটো পা বেরিয়ে রয়েছে মনুর। মেনাজের বুক ঠেলে আর্তধ্বনি বেরিয়ে আসতে চায়।

—হাম্বোয়া-য়া—

মাথা হেলিয়ে পা আছড়ে সে চিৎকার করে ওঠে। তাকায় মেনাজের দিকে। চোখে জলধারা। নাকটা ফুলছে, কাঁপছে। শ্বাস বইছে ঘন ঘন। ঠোঁটে লালা।

জীবনদাত্রী মনু, তার জীবনের প্রিয়তম ধন মনু; তার কষ্ট থেকে উদ্ধারের জন্য আজ মেনাজকে ডেকে আকুল। কিন্তু মেনাজের কী সাধ্য তা লাঘবের? পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যায় তার চোখে। এমন দিশেহারা আর কোনোদিন মনে করেনি সে নিজেকে। যে ক্ষেত খাদ্য যোগায় তা আধচষা অবস্থায় বুক ছড়িয়ে আছে। মনুকে উপলক্ষ করে রাবেয়ার সঙ্গে মনোমালিন্য। ভালোবাসার ভাঙন। খোদা না করুন, যদি ওর মৃত্যু ঘটে তবে তার সম্মুখেও তো নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকার। সে অন্ধকারের বন্যায় সব ভেসে যাবে!

অকস্মাৎ সে মনুর গলা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ইচ্ছা করে দুনিয়ার মানুষকে ডেকে বলে—দেখ এসে কী নিদারুণ মৃত্যু। পশু, সামান্য একটা পশুর মৃত্যু আরো মৃত্যু-তমসার কী উত্তাল ঢেউ নিয়ে ছুটে আসছে। ওগো মানুষ, তাকে প্রতিরোধ করে আমার জীবনদাত্রীকে বাঁচাও। জীবনমূল থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে দিও না।

# মুক্তি

চুপে চুপে কাজ সারতে হবে। কেউ টের পেয়ে গেলে কেলেঙ্কারি। পরে ওকে না দেখে কেউ যদি খোঁজ খবর করে তখন বলে দিলেই হবে রাতের অন্ধকারে কোথায় পালিয়ে গেছে কে জানে! আর গায়ে পড়ে খুব বেশি সন্ধান নিতে এলে সবকথা না হয় বলেই ফেলবে চেরাগ আলি। এখন আর পরোয়া কাকে তার। না খেয়ে ঘরের খাঠালে এতোদিন ক্ষুধায় কাতরাল তাতে খবর করল কেউ? না কারো দুয়ারে দু'কণা সাহায্য পাওয়া গেছে?

এবার অতিষ্ঠ জীবন থেকে উদ্ধার। মরণ থেকে নিষ্কৃতি। অভিশাপ থেকে মুক্তি।

এখন ভোর রাত্রি। আরেকটু পরেই পুবের আকাশে দেখা দেবে লালচে সকাল। চারিদিক নীরব। নির্জন। ঘরের খোড়ো চাল থেকে ছাঁচতলায় শিশিরপড়ার আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। শেষ রাত্রির জ্যোৎস্না সত্ত্বেও উঠোনে এখনো অন্ধকার। সেইখানে অধীর চিত্তে দাঁড়ানো চৈতন দাস ছাড়া কোথাও কোনো প্রাণী নেই যে দেখতে পাবে।

চৈতন চাপা স্বরে বললে, খালের ঘাটে নৌকো ঠিক, এবার চটপট ওকে তুলে দাও হাওলাদার।

চেরাগ আলি গুটি গুটি ঘরে গিয়ে উঠল। চৈতনও এগিয়ে এল ছাঁচতলায়—আঃ দেরি করে লাভ কী! তাড়াতাড়ি করো,

ভোর হলে মুশকিল হবে! চেরাগ আলি ফিসফিসিয়ে বললে—দেশলাই আছে?

কিন্তু বাতি জ্বেলেও চেরাগ আলি চুপ করে বসে থাকে। তখন তাকে যন্ত্রের মতো মনে হয় চৈতনের, দম না দিলে কাজ করে না।

ইঙ্গিত করে সে মৃদুকণ্ঠে কাশে।

চেরাগ আলি দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার তাকায় জয়তুনের দিকে। তখনো সে ঘুমন্ত। পাশ ফিরে ঈষৎ বঙ্কিমভাবে শোয়া। একখানা হাত শিয়রের নিচে, অন্যখানা সামনে ছড়ানো। একটু আগেও চেরাগ আলির গলা জড়িয়ে ছিল। বুক পর্যন্ত কাঁথা টানা। একটি ভরপুর গোলাপি স্তন উঁকি দিচ্ছে তার কানা থেকে। চোখে মুখে অনাহারের কালিমা সত্ত্বেও নির্লিপ্ত শান্তি। অনেকদিন পরে চৈতনের দানে পেটপুরে খেয়ে এখন সে কোনো সুখস্বপ্নে বিভোর।

কপালে গত দুপুরের মারার দাগটা এখনো স্পষ্ট। অনেকখানি স্থান কালো হয়ে ফোলা। চেরাগ আলির স্তব্ধতা দেখে চৈতন হাতিনায় উঠে আসে—কী হোলো তোমার? দেরি না করে এখুনি তুলে দাও, সকাল হলে গ্রামের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না যে!

চেরাগ আলি মুখ তুলে তাকায়।

—টাকার কথা ভাবছ? এই নাও।—ফতুয়ার পকেট থেকে চৈতন কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা চেরাগ আলির হাতে তুলে দেয়—পিদিমের আলোতে ঝটপট গুণে নাও। তারপর ওকে ওঠাও শীগ্‌গির—

চেরাগ আলি টাকাগুলি হাতে করে তবু ইতস্তত করে।

ধৈর্য থাকে না আর চৈতনের—ওকী! বসে রইলে যে পাথরের মতো। হয় তুলে দাও, নয়তো—

চেরাগ আলি টলটলে চোখে বলে ওঠে—মন সায় দিচ্ছে না দাসমশায়, হাজার হোক—

—শেষকালে তোমার এইকথা? মাথা খারাপটার জন্যে এত দরদ। একে পাও না খেতে, তার ওপর ভোর হলেই তো আবার এর ওর পাড়াপড়শীর সঙ্গে চুলোচুলি করবে, তোমার সাথে করবে মারামারি। তার চেয়ে নগদা এই এতোগুলো টাকা পেয়ে খেয়ে বাঁচা পছন্দ হোলো না বুঝি! কাল আমায় কথা দিয়েছো—

জয়তুনের ঘুম ভাঙার ভয়ে হাতিনায় নেমে আসে চেরাগ আলি। জয়তুনের হাতে মার খেয়ে কালকেই সন্ধ্যায় চৈতনকে অনাহারের মাথায় পাকা কথা দিয়েছিল বটে সে, কিন্তু ক্ষুধা আর উত্তেজনা কমে যাওয়ার পর এখন তাকে মনে হয় দুঃস্বপ্ন।

অথচ চৈতন যা বলে তার এতটুকুও মিথ্যে না। জয়তুনকে নিয়ে জীবন সত্যি দুর্বিসহ। ঐ পাগলীটাকে বিয়ে করার পর থেকেই জীবনে যেন দুর্ভাগ্যের ঘুণ ধরেছে। এমনিতেই তো সাংসারিক দুঃখকষ্ট, অনাহার অত্যাচারে দেহ মন ক্লিষ্ট ও পীড়িত; তার উপর ঝোঁকের মাথায় জায়গা জমি বেচে খরচপত্র করে দূর দেশ থেকে সে বউ নিয়ে এল ঘরে। এসে তার সহানুভূতি দূরে থাক, উলটে তার খামখেয়ালী পাগলাটে চরিত্রের নানা দুষ্কার্যের জন্য পড়শীদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল চেরাগ আলি। শুধু রূপ দেখে হঠাৎ বিয়ে করা সে এক চরম ভুল হয়েছিল তার। নিঃস্ব হয়ে ওকে ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গেই অনটন শুরু হোলো; তারপরে এসেছে এই আকাল। চাল নেই,

ডাল নেই ; কোথাও আছেও বা যদি, কেনবার নেই কড়ি, সুতরাং উপোস করে চেরাগ আলির মনে হোতো সে অনাহারে বেঁচে নেই আর, বরং তার স্থলে তারই কোনো প্রেতাত্মা চারিদিকের দুর্যোগের ঝাপটা নিয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে। তারই মাঝে যখন অনাহার অথবা অন্য কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ উপলক্ষ্য করে জয়তুন তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাত—যখন কোনো অভিযোগ করত তার বিরুদ্ধে চেরাগ আলির জীবন তখন আরো অতিষ্ঠ বলে মনে হোতো।

কখন বা হঠাৎ যেত বউকে এলোপাথাড়ি মারতে। হাউ মাউ কান্না আর বীভৎস চিৎকারে পাড়াপড়শীরা ছুটে এসে দেখতো রণরঙ্গিণী জয়তুন চেলাকাঠ দিয়েই বেদম পিটছে দুর্বল নিরীহ চেরাগ আলিকে।

সেই চেরাগ আলিকে পাড়াপড়শীরা কোনো রকমে তার কবল থেকে উদ্ধার করার পর কেবলই সে প্রতিজ্ঞা করত—এবার জীবনের ও অভিশাপকে সে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবেই।

কিন্তু তালাকের কথা শুনেই জয়তুনের পা ছড়িয়ে বসে সে কী কান্না! চেরাগ আলি মায়ায় পড়ে কখন যে আবার প্রতিজ্ঞা ভুলত তা নিজেরও খেয়াল থাকত না।

গত সনে ছেলে হোলো একটা। তাকে কোলে করে পাগলামীটা অনেকখানি কমে এসেছিল। একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল চালচলন কথাবার্তা। ছেলে কোলে নিয়ে যখন ছড়া কেটে আদর করত, চেরাগ আলি মুগ্ধমনে কাছে গেলে বলে উঠত—কাজ নেই তোমার আদরে। শখ করে ছেলের বাপ হয়েছ। বাছারে আমার কী দিয়ে সাজালে বলো দেখি?

চেরাগের মুখ দেখাতো অন্ধকার। চেয়ে দেখতো ছেলের গায়ে বড়োবাড়ি থেকে চেয়ে আনা একটা তালিদেওয়া পুরোনো জামা।

বার্লি নেই, ময়দা নেই, ক্ষুদের ভাত দলাকরে খাওয়ায় জয়তুন, অথবা কারো কাছ থেকে চেয়ে আনা একটু পালো—

জয়তুন দুষ্টুমির চোখে চেয়ে বলতো, রাগ হোলো বুঝি?

তারপর কাছে এসে ছেলেকে তার কোলে ঠেলে দিতো। আর হঠাৎ গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে ফিক করে হেসে ফেলত—দোহাই তোমার, মসকরা করেছি, রাগ কোরো না।

কিন্তু মাসতিনেক আগে সেই ছেলে মারা যাবার পর থেকে জয়তুনের আবার যেকে সেই অবস্থা। সময় সময় তার হাসি কান্না, গালাগালি, ঝাপট-দাপট দেখে মনে হোতো এবারে সে বদ্ধ উন্মাদ।

গতকাল বাড়ি ফিরতেই জয়তুন ঝাঁটা হাতে তাকে তেড়ে এল, হারামজাদা আমার ছেলে নিয়ে আয়।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে কারো দোরে এককণা সাহায্য পায়নি চেরাগ আলি, ক্ষুধায় মাথা ঝিম ঝিম করছে। রোগা মানুষ বলে কোনো কাজেও লাগায় না কেউ। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিল—কতজনের স্ত্রীও তো এর ওর বাড়িতে কাজ করে করে সংসার চালাচ্ছে, আর তার বেলা এ কি অভিশাপ।......

ঠিক শেষকালে জয়তুনের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না চেরাগ আলি। কিছুদিন থেকে নতুন এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে, জয়তুন মনে করে তার ছেলের মৃত্যুর জন্য চেরাগ আলি দায়ী।

সে কাছে এগোতেই তাকে ঝাঁ করে এক চড় কষিয়ে হাতিনায় উঠে বসে পড়ে চেরাগ আলি।

জয়তুন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। উঠনে দাঁড়িয়েই তাকে উদ্দেশ করে শুরু করে অশ্রাব্য গালাগালি। তারপর ছোঁড়ে ঢিল।

চেরাগ আলি তখন তামাকের জন্য ডিবে হাতড়াচ্ছিল। একটা

ঢিল গায়ে লাগতেই খানিকক্ষণ থমকে ব্যথা সংবরণ করে ডিবেটা সে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেটা লাগল গিয়ে জয়তুনের কপালে, সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় বসে পড়ল জয়তুন।

চেরাগ আলি হাতিনা থেকে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ একটা ভিটায় গুম হয়ে বসে বসে অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে মনস্থির করে একেবারে সোজা চৈতন দাসের কাছে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

অথচ সেদিন দুপুরেই সে চৈতনের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এসেছিল।

—কথা কইছ না যে! কথা দিয়েছ!—আগাম চাল এনেছ—আর এখন টালবাহানা?

চেরাগ আলি তথাপি নিরুত্তর।

চৈতন কণ্ঠস্বর একটু নরম করে আরেকটা অস্ত্র প্রয়োগ করে—বুঝি, একটা বিড়াল পুষলেও তার উপর মানুষের মায়া পড়ে। কিন্তু না খেয়ে মরতে বসলে ওসব দয়ামায়ার মূল্য কী ভাই! সুখেস্বচ্ছন্দে নিজে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে বড়ো কথা। তবে যা তোমার বউ, ওর চেয়ে একটা বেড়াল পুষেও শান্তি। নাও নাও, এই আরো দশটা টাকা না হয় রাখ। তারপর ছেলেমানুষী না করে তুলে দাও—শহরে যেনো ভালোভাবেই রাখবো, ইচ্ছে করলে তুমিও গিয়ে যখন তখন দেখে আসতে পারবে। এদিকে ভোর যে হয়ে এল—তুলে দেবে তো দাও এই বেলা নয়তো আমি চলে গেলে কিন্তু আবার তোমাকে পস্তাতে হবে! এই ধরো টাকা।

চেরাগ আলি একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে যন্ত্রচালিতের মত ফিসফিসিয়ে

বললে, আচ্ছা আপনি যান নৌকোর কাছে, আমি নিয়ে আসছি। নইলে আপনাকে দেখে আবার বেঁকে বসতে পারে।

চৈতন অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে, পরে আশ্বস্ত হয়ে নিচে নেমে গেল।

দম না দিলে কাজ করবে না হাড়ের যন্ত্রটা। কাছাকাছি থাকতে হবে। ইস্, মেয়েটাকে দেখে অবধি মনে সুখ ছিল না। যন্ত্র চালাবার চাবিটি হাতে পেয়ে এতোদিন পরে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে চৈতন। যে যন্ত্রই হোক, চাবি ঠিক থাকলে কাজ করবেই।

টাকাগুলি গুনে গুনে কোঁচরে গুঁজে রাখে চেরাগ আলি। তারপর ঠেলে জাগায় জয়তুনকে।—শুনছো?

জয়তুন চোখ রগড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়—কী?

চেরাগ আলিকে দেখে তার মুখ পানে চেয়ে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

—এখন আবার আদর করতে এসেছ বুঝি?

আদর করার কারণ আন্দাজ করে সে এমন একটা অশ্লীল উক্তি করে ওঠে যে চেরাগ আলিও তার সামনে লজ্জায় নুয়ে পড়ে।

—না, তা নয়! ছেলের কাছে যাবে? গ্যাদাকে পেয়েছি।

—কোথায়?—ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে জয়তুন। চোখে তার সংশয় না আনন্দ ঠিক বোঝা যায় না।

চেরাগ আলি বলে, শহরে। দেখতে চাও যদি তোমাকে এখুনি নৌকো করে রওনা হতে হবে!

জয়তুন কেঁদে ফেলে—পাওয়া গেছে গ্যাদাকে, আমার গ্যাদাকে?

—আঃ, কেঁদো না! যাবে তো চল।

কান্না থামিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে জয়তুন। অসংবৃত বেশ বিন্যস্ত করতে যেয়ে আরো অগোছাল করে ফেলে। বাইরে পা

দিয়েই বলে ওঠে, কিন্তু ওগো, কেমন করে যাব? ঘরদোর এই মতো থাকবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা থাক। দেরি করলে হয়তো—কী বলতে চেয়ে কথা খুঁজে পায় না চেরাগ আলি।

—দেরি করলে আর তাকে পাব না? ওগো আমার কী হবে গো!—

চেরাগ আলি সসব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—আঃ থামো, চুপ করো, চুপ করো, কাঁদলে আর তোমাকে নিয়ে যাব না!

জয়তুন চুপ করে তখন, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার হঠাৎ বাড়ির দিকে ছোটে—গ্যাদার ঝুনঝুনিটা নিয়ে আসি। সেই যে কিনে দিয়েছিলাম, মনে নেই তোমার—?

চেরাগ আলি অপেক্ষা করে। চৈতন দাস ক্ষেপে চলে না যায় আবার। অনেকক্ষণ বাদে জয়তুন ফিরে আসে। শুধু ঝুনঝুনিটাই নয়। গ্যাদার স্মৃতি মাখা আরো অনেক জিনিস সে গাঁটরি বেঁধে নিয়ে এসেছে—পুরোনো কাঁথা, ছোটো বালিসটা—জামা।

তার অজস্র প্রশ্নের, বহুবিধ খেয়ালের উত্তর দিতে দিতে শ্রান্ত হয়ে চেরাগ আলি ঘাটে পৌছাল। ইঙ্গিত করে মাঝিকে নৌকো কাছে আনতে বলে।

কিন্তু তখন ভাঁটার টান। জল গেছে নিচে নেমে। নৌকো পাড়ে আনা সম্ভব হয় না। অগত্যা চেরাগ আলিকেই জয়তুনকে পাঁজা কোলা করে তুলতে হোলো।

—চলো তোমাকে উঠিয়ে দি।

টাল সামলে জয়তুন তার গলা জড়িয়ে বলে উঠল, কেন, তুমি যাবে না?

—না আমি,—আমি কাল যাব? ঘরদোর গুছিয়ে আসতে হবে না?

—ওমা! তা কী করে হয়! আমি তাহলে কার সঙ্গে যাব? তবে কালই না হয় আমিও—

—না, না, দাসমশায় শহরে যাচ্ছেন, তার সঙ্গেই তুমি যাবে। তিনিই তো গ্যাদার সংবাদ নিয়ে এসেছেন। লক্ষ্মিটি, কোনো ভয় নেই তোমার,—

—কই, দাসমশায় কোথায়?

মাঝি লগি কাদায় ঠেলে বললে, তিনি নৌকের মধ্যেই বসে আছেন। চৈতন দাস ছইয়ের বাইরে দেখা দেয়। এইযে আমি! এসো, কোনো ভয় নেই তোমার!

—গ্যাদা ভালো আছেতো দাসমশায়?

—হ্যা হ্যা, খুব ভালো! তোমাকে কেবল দেখতে চায়,তাইতো তোমাকে নিতে এসেছি।

—তাহলে আগে বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমরা আমার স্থমুখ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়েছিলে? তাইতো ভাবি—পাটাতনের উপর নামিয়ে দিতেই দাসমশায়ের হাত ধরে হিহি করে হেসে উঠল জয়তুন—গ্যাদার কাছে যাবো! চলো মাঝি চলো:

তারপর হঠাৎ চেরাগ আলিকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিগ্যেস করে—ও কী! তুমি অমন করে তাকিয়ে আছো যে! তুমি আসছো তো কাল?

তবু চেরাগ আলি জবাব দেয় না দেখে সে দাসমশায়ের একখানা হাত ধরে আবদারের গলায় বলে ওঠে, ও দাসমশায়, তুমি একটু বলে দাও না!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও কাল আসছে। তুমি যাও হাওলাদার, ঘর খালি রয়েছে।

—চৈতন চেরাগ আলিকে ঘরে যেতে ইঙ্গিত করে। জয়তুনের গায়ের স্পর্শে তার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

—কাল আসছ তো তুমি?

—হ্যাঁ।—চোখ শাসিয়ে কথাটি যেন অতি কষ্টেই উচ্চারণ করে চেরাগ আলি তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে যায়।

জয়তুন কাঁপাস্বরে পিছুডেকে বলে—এসো কিন্তু কাল, কে রেঁধে দেবে, কী করবে ভাবি!—ভালো কথা, হাঁড়িতে পান্তাভাত ঢাকা দেওয়া আছে, সকালে খেও।

তারপরেই আবার হি হি করে হেসে ওঠে—কী সর্বনাশা কথাই এতোদিন ভেবেছি!—চৈতনের গায়ে ঝুঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে ফিসফিসিয়ে বলে, জানেন দাসমশায়, ভেবেছিলাম গ্যাদা মরে গেছে। কী অলক্ষুণে ভাবনা, না? বলে হি হি করে হেসে চৈতনের গায়ে আরো ঢলে পড়ে। চৈতন কাঁপাগলায় মাঝিকে আদেশ করে, তাড়াতাড়ি বাও হে! এসো তুমি ছইয়ের মধ্যে এসো। এতো কথা বোলো না, চুপটি করে ছইয়ের মধ্যে বসো, না হলে কিন্তু আমি নিয়ে যাব না। জয়তুন নিরীহভাবে ছইয়ের মধ্যে ঢোকে। আর দেখা যায় না তাকে।

মন দুর্বল করে লাভ নেই। জীবনের যা অভিশাপ নির্দয়চিত্তে তাকে বর্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কোঁচরের টাকাগুলির উপর হাত বুলিয়ে বাড়ে বাড়ে তবু একবার পেছনে না তাকিয়ে পারে না চেরাগ আলি।

অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না। থাক, এবারে মিলেছে

মুক্তি। মিলেছে নিঃস্বতা থেকে প্রাচুর্যে যাবার পথ। দুর্ভাগ্যকে দমনের পুঁজি।

ভোর হতে এখনো কিছুটা দেরি আছে। ঘরে ফিরে খানিকক্ষণ নিজের স্তব্ধতায় নিজেই অস্থির হয় চেরাগ আলি। বাতির আলোয় টাকাগুলো গুনে একটা বাঁশের চোঙে পুরে ফেলে চালে গুঁজে রাখে। তারপর তামাকের ডিবেটা খুঁজতে খুঁজতে ভাবে কাল সকালে জয়তুনের যারা খোঁজ করবে বাড়ির নিস্তব্ধতা দেখে, তাদের জবাব দেবে কী! নিত্যকার মতো সকালে ঘাটে যাবে না, পড়শীদের সঙ্গে কোন্দল করবে না, যখন তখন অকারণে তার হাসিকান্নার শব্দ শোনা যাবে না—সবাই অবাক হবে না কী!

দুর্ভাবনা থেকে বাঁচবে ভেবেছে চেরাগ আলি। কিন্তু সত্যি বলতে কী কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তার। অস্থির হাতে ডিবেটা খুঁজে খুঁজে কোথাও পায় না। হঠাৎ মনে পড়ে কালকের ঘটনাটা। হয়তো এখনো উঠোনেই সেটা।

কপালটা ফুলে উঠেছিল জয়তুনের। খুব লেগেছিল নিশ্চয়। নইলে ঐভাবে বসে পড়ে। ফাটেনি যে তাই বাঁচোয়া। কিন্তু ওর হাতের ঢিলে তার বুকেই বা কম লেগেছে কী? তবু—

সেদিকে গিয়ে ডিবেটা কুঁড়িয়ে তলাটা চেঁচে খানিকটা তামাক খেলে। চৈতনের সেই দেশলাইটা কোমরেই ছিল, ফেরৎ দেওয়া হয়নি আর!

বাতি জ্বেলে জয়তুনকে দেখেই মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠেছিল। কাল সমস্ত রাত রাগারাগির মাথায় আরো অনেক দিনের মতো

বিছানার দুদিকে শুয়ে রইল দুজন। কিন্তু কখন যে জয়তুন তার গলায় হাত রেখে খানিকটা সরে এসেছিল······

বিছানার বালিশে এখনো তার দেহের ছাপ। ঐ কাঁথাটা সরিয়ে আলুথালু ভাবে আধো সংশয়, আধো আগ্রহে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল······তারও একটু আগে যে কথাটা উচ্চারণ করেছিল! ······লজ্জাসংকোচের কোনো বালাই নেই তার!······বিয়ের পর আদর করলে ভয় পেত······কাঁদতো······মিনতি করতো······তার পর ছেলে হবার পর থেকে আর সে সব রইল না······কখন যে তার লজ্জা, আর কখন যে কী!

কিন্তু ভোর হয়ে গেছে প্রায়। জয়তুন বলেছে পান্তাভাত আছে। তামাক খাবার আগে খেয়ে নিলে মন্দ হয় না।

রান্নাঘরে থরে থরে হাঁড়িপাতিল সাজানো। অনেকদিন পরে কাল সেগুলোর শূন্য উদর ভরেছিল। প্রথমে তো জয়তুন রাঁধবেই না। অবশেষে চেরাগ আলি নিজেই রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে রেগেমেগে হাঁড়িকুড়ি ফেলে চাল চিবুতে বসেছিল। জয়তুনেরও পেটে তখন ক্ষুধা, মুখেই না লাজ। খানিক পরে নিজেই উঠে চালের পুঁটলীটা নিয়ে রাঁধতে গিয়েছিল। সরা সরিয়ে চেরাগ আলি দেখে বেশ কিছু আছে পান্তাভাত।

পিঁড়ি পেতে বাসনে ভাত বেড়ে নিল চেরাগ আলি। কিন্তু খাবে কি দিয়ে? লঙ্কা খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে জয়তুনের নিজের হাতে লাগানো উঠোনের কানরাঙ্গা ঝাল গাছের কথা। তারই একটা ছিঁড়ে এনে ভাতে মেখে নেয়।

খেতে খেতে বড়ো শান্ত আর নিরুপদ্রব মনে হোলো

নিজেকে। অনেক স্বাধীন। এতো শান্তিতে খাওয়া জোটেনি বহু দিন। অন্য সময়, হয়তো বহু কষ্টে জোগাড় করে আনা ভাত খেতে খেতে হরেক রকম অভিযোগ গঞ্জনা শুনতে হোতো তাকে, অথবা তটস্থ হয়ে থাকতে হোতো ওর কোনো পাগলাটে আচরণের ভয়ে।... তাছাড়া আরাম করে পেটপুরে এতো খাওয়া...আঃ! চেরাগ আলি আস্তে আস্তে আরাম করে খায়। কিন্তু, উঃ যা শীত! হাত পা যেন ঠকঠক করে কাঁপে। এতোক্ষণ খেয়াল হয়নি, এইবার মনে পড়ে জয়তুনকে নৌকোয় তুলে দিয়ে কাদা ধুয়ে পাড়ে ওঠার সময় ঠাণ্ডায় তার তার হাত পা যেন জমে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁতে ঠকঠকানি।...জয়তুনের দেহে আঁচল ছাড়া একটা জামাও নেই!

হঠাৎ বিষম খায় চেরাগ আলি। কে মনে করল, জয়তুন? হবেও বা।

কয়েক গ্রাস খেয়ে আর মুখে রোচে না। পাতের ভাতগুলো দেবার জন্য উঠোনের কুকুরটাকে ডাকে। কিন্তু সেটাও যেন কোথায় ভেগেছে। এলে দেওয়া যাবে, মনে করে ভাত শুদ্ধ বাসনটা ঢেকে হাত মুখ ধুয়ে উঠে এল চেরাগ আলি।

চোখে পড়ে জয়তুনের পানের থালাটা। পান নেই, সুপুরি নেই। সুপুরি যেন অন্য কোথায় রাখত জয়তুন। এদিক ওদিক সে খোঁজে। সারা ঘরখানাই তার চোখে যেন নতুন লাগে। পাগল হলে কী হবে কোথাও এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা রাখেনি জয়তুন। সব দিক সুন্দর করে সাজানো গোছানো। তার নিজের হাতে শেলাই করা কাঁথাগুলো ভাঁজে ভাঁজে আড়ায় ঝুলানো। তার পাশে ঝুলছে কয়েকটা ছোট হাঁড়ি—তার একটার মধ্যে কবেকার ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো বাতাসা। আর একটায় ছেঁড়া পুঁতির মালা। শখ করে

হয়তো চেরাগ আলি তাকে কিনে দিয়েছিল কোনো দিন। কোনোটায় নানান হাবি জাবি। লোহা, লক্কড়, ঝিনুক, বোতাম কত কী! কয়েকটা তাগাছেঁড়া তাবিজ, কতো জায়গা থেকে কত ফকিরের কাছ থেকে এনে দিয়েছিল জয়তুনকে—ঝগড়া বাঁধলেই রাগ করে খুলে রেখে দিতো!

তার ওপাশে একটা কাঁচের শিশিতে কালো কালো সরু আমের আচার। মাথা খারাপ না হলে যে কোনো মেয়ের ঈর্ষার বস্তু হোতো জয়তুন। শূন্য মটকীটার উপর থেকে ন্যাকড়ার গাঁটরিটা সরাতেই সরার উপর সুপুরি মিলল।

তারপর হুঁকো হাতে নিয়েও মাথায় নানা ভাবনা ভিড় করে আসে। জয়তুনও তামাক খেতো। ব্যাটাছেলের মতোই।...এই হুঁকোয়। চেরাগ আলি, সেই একই জায়গায় মুখ রেখে টানছে...ভাবতে ভাবতে টানগুলো কেমন নিস্তেজ হয়ে আসে। টানতে আর ভালো লাগে না। শরীরটাও কেমন ঝিম ঝিম করে।

হুঁকোটা রেখে কাঁথা জড়িয়ে শীতে গুটিসুটি দিয়ে বিছানায় এসে শোয়। ভোর হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ঝলমলে রোদ ওঠে আকাশে। কেমন আলসে মনে হয়।

জয়তুনের মাথার ছাপটা বালিশে এখনো স্পষ্ট। নায়েবের খাজনাটা দিয়ে আসতে হবে। বাড়ি ছেড়ে দেবার হুমকী দিয়ে গেছে সেদিন। হয়তো আজই তার পেয়াদা এসে পড়বে। কিন্তু টাকা হাতে পেয়েও তার ওখানে যাবার উৎসাহ পায় না চেরাগ আলি। দেহটা কেমন ঝিমিয়ে গেছে। মনটা ফাঁকা ফাঁকা। অন্যদিন এমন সময় হয়তো তার চিল্লা চিল্লীর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠানো দায় হোতো। আজ সম্পূর্ণ নিরালা। একজন সরে গেলে কবরখানা থেকে ঘরে

ফিরে ঘরকে যেমন মনে হয় তেমনি কোনো শব্দ আসে না বাইরে। কুকুরটাও ফিরে আসেনি। নির্জনতায়, নিঃশব্দ মনটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

চৈতন ঠিক বলেছে, একটা বিড়াল পুষলেও তার ওপর মায়া পড়ে মানুষের। হোক মাথা খারাপ লোক, পাগল, তবু মন থেকে মোছা যায় না তাকে। তার কথা ভাবল, তবু চতুর্দিকে তার হাতের ছাপ, স্মৃতির আঁচড়, অনুপস্থিতির শূন্যতা—যেনো করাতের মতো চেরাগ আলির মনকে খণ্ডবিখণ্ড করে। এই ঘরে, এইখানে সে যে কতোখানি নিয়ে জুড়ে ছিল, আজ শূন্য হতেই তা ধরা পড়েছে। নিষ্কৃতি আর উদ্ধার পেতে চেয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেল চেরাগ আলি।

বালিসে জয়তুনের মাথায় ছাপের মধ্যে মুখ রেখে হঠাৎ তার কান্না পায়। মনের চাপাদেওয়া সমস্ত আবেগ, দুইটি বছরের সুখে দুঃখে ভরা প্রতিটি মূহূর্ত—সব যেন উদ্দাম জোয়ারের মতো চেরাগ আলির চোখ ছেয়ে আসে। কোঁচরের টাকাগুলো অনুভব করে কতো নগণ্য, কতো তুচ্ছ মনে হয় তাকে!

অকস্মাৎ বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে চেরাগ আলি। না আর থাকা যায় না এই ঘরে!

বিশাল গাঙে মিলিটারীর সেরা দালাল চৈতন দাসের পানসী রাত্রির জোয়ারে পাল তুলে কোথায় হারিয়ে গেছে। গাঙের পাড়ে ছুটতে ছুটতে এসেও তার আর কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় না।

# জোর যার

নদী ক্রমান্বয়ে আগাইয়া আসিতেছিল।

পাড় ভাঙিয়া ভাঙিয়া মরিয়মদের ঘরের বড় জোর আর সাত-আট হাত দূরে আসিয়া থামিয়াছে। বর্ষায় নদীর যে স্রোত, তাহাতে যে কোনো মুহূর্তেই ভাঙিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু কেন, কে জানে বলা চলে অস্বাভাবিকভাবেই, দিন-দুই ছোবলের পর ছোবলে পাড় ভাঙিবার পর নদীর আর কোনো উদ্‌যোগ-আয়োজন দেখা গেল না। হঠাৎ যেন সে তাদের প্রতি সহানুভূতিময় হইয়া উঠিয়াছে।

এই ঘরবাড়ি ভাঙিয়া গেলে অন্য কোথাও আর তাহাদের দাঁড়াইবার জায়গা নাই। জমির প্রায় সর্বাংশই তো গেছে নদীর গর্ভে, এখন বাকি আছে শুধু এই ঘর উঠান আর পাড় হইতে ঘরের পিছন পর্যন্ত ছোট মরিচের ক্ষেতটুকু। মরিয়মের বাবা রহমালি তো ভাবিয়া পায় না যে কোথায় যাইবে। গ্রামে বা বহু দূরেও কেউ কোনো আত্মীয় কুটুম্ব নাই যে তাহার ঘরে গিয়া উঠিবে। অন্য কাহারও ঘরে আশ্রয় চাহিলে হয়তো দুই একদিনের জন্য জুটিয়াও যায়, কিন্তু তারপর? আকালের দিন সকলেই নিজ নিজ ঘর-পরিবার সামলাইতেই ব্যস্ত, আশ্রয় যে তাহাদের কেউ দিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কী! আর তাহা ছাড়া গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও খুব ভালো নহে। রহমালি গ্রামের সর্বাপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন চাষী ছিল এককালে, আজ নানান দুর্দৈবে অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ঈর্ষিতেরা উল্লসিত।

কাজেম আলি তাহাদের মধ্যে একজন। তার সঙ্গে তো গ্রামের প্রায় সকলেরই শত্রুতা। অতীতের মনোমালিন্যের ইতিহাসটা ভুলিয়া সে রহমালির কাছে মরিয়মকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। রহমালি সম্মত হয় নাই। তাহার কারণ একেতো তাহার স্বভাব চরিত্র খুবই খারাপ। লোকে কানা-ঘুষা করে, কুৎসিত ব্যাধিতেও নাকি সে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মেয়ে টাকাওয়ালা বড়মানুষের ঘরে পড়িলেও ভবিষৎ জীবন যে সুখের হইবে না, তাহা অনায়াসে অনুমান করিয়া রহমালি তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তারপর হইতে কাজেম আলি যেন তাহার উপর আরো ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের প্রায় সকলেই তাহার অত্যন্ত অনুগত। উপরন্তু কাজেম আলি তাহাদের সাবধান করিয়াও দিয়াছে যে রহমালির দেমাক ভাঙিল বলিয়া। ঐ পাড় ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙিবে। খবরদার, তখন কেউ যেন ওকে ঘরে জায়গা না দাও।

বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে দেমাক আবিষ্কার করিয়াছে কাজেম আলি। উঁচুঘরের বলিয়াই হয়তো তাহার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগিয়াছে। কাজেম আলির বংশ সত্যিই খুব বড়। বাড়িতে এখনও দুই দুইটা কাছারি। বেশ বড় তালুকদার। তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে রহমালির সমস্ত দুঃখকষ্ট ঘুচিত, আশ্রয়ের সন্ধান যে করিতে হইত না তাহাতে সন্দেহ কী! তাহাদের মত নিচু ঘরে, যাহারা কোন দূর গাঁ হইতে এখানে আসিয়া রহমালির মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমের জোরে মজুরের মত একটু একটু করিয়া সংসার গড়িয়াছে, তাহাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে যাওয়াও কাজেম আলির পক্ষে অনেক হীনতা এবং রহমালির আকাশের চাঁদ পাইবার মত সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু তবু—

যাইতে পারে আর এক বাড়ি। ফয়জুল্লা বা ফজুর বাড়িতে। সে ছেলেটি গরিব হইলেও ভালো। যদিও সে কাজেমের প্রজা, তবু তাহার ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া সে তাহাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করে। কোনো আত্মীয় স্বজন নাই তাহার, না আছে জায়গা জমি। ক্ষেতে ক্ষেতে বদলা খাটিয়া কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করে। তবু তাহার ঘর তো একখানা ছিল, বিপদে পড়িয়া সেখানে ওঠাও চলিত কিন্তু সে পথও রুদ্ধ করিয়াছে রহমালি। না করিয়া উপায় ছিল না।

সেও মরিয়মকে বিবাহের মতলব করিয়াছিল। রহমালি বুঝিতে পারিয়া পূর্বাহ্ণেই তাহাকে নিরাশ করিয়া দিয়াছে। চালচুলো যাহার ঠিক নাই, সে শত ভালো হইলেও বাপ হইয়া তাহার মেয়েটাকে এমন বিসর্জন দেয় কী করিয়া।

এদিকে নদী ক্রমান্বয়ে আগাইয়া আসিতেছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও তাহার ছলাচ্ছল জলকল্লোলে ধ্বংসের করতালি শুনিতে পায় রহমালি। এক রাত্রেও ঘুমাইতে পারে না। চাপ চাপ মাটি ভাঙিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের এক একখানা পঞ্জরাস্থি ও মন যেন ভাঙিয়া পড়ে। স্ত্রী, মরিয়ম, সাত বছরের ছোট ছেলেটি সকলেই তো সর্বদা তটস্থ। কোন সময় যে এক বিরাট চাপসুদ্ধ তাহারা ঘর বাড়ি সমেত নদীর গর্ভে লুপ্ত হইয়া যাইবে কে জানে।

কী করিবে ভাবিয়া রহমালি দিশেহারা। সম্মুখে আগাইয়া আসিতেছে নিশ্চিত মৃত্যু। যে-ক্ষেতে দেহের রক্ত জল করিয়া শস্য ফলাইয়াছিল, তাহা গেছে গাঙের গর্ভে। এবার যাইবে বাড়িঘর। কয়েকদিনের জন্য তখন কোথাও না হয় আশ্রয় মিলিলই কিন্তু তাহার পর!

বাড়ির উত্তরে নদী। দক্ষিণে ছোট একটু উঠানের পরে খাল। তাহার ওধারে আসল গ্রাম। এদিকে বসতি খুবই অল্প। যাহারা ছিল, আগেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, অথবা অন্যত্র সরিয়া গেছে।

উঠানের পরে আম বাগানের মধ্য দিয়া মরিয়ম কলসী কাঁখে খালের ঘাটে যাইতেছিল, পথে কাজেম আলির সঙ্গে দেখা। সম্ভ্রম করিয়া ঘোমটা টানিবার চেষ্টা করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল মরিয়ম। কাজেম আলি ঠিক পথের উপর দাঁড়াইয়া কহিয়া উঠিল—এই যে তোমাদের ওদিকেই যাচ্ছিলাম। তোমার বাপ আছে বাড়িতে? মরিয়ম মৃদুস্বরে কহিল—না।

বলিতে বলিতে আরো সংকুচিতভাবে সে পথের একেবারে কিনারায় সরিয়া আসিল।

কাজেম আলি অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিল—ভয় পেয়েছো বলে মনে হচ্ছে যেন?

অপরিচিত নয় সে মরিয়মের। তাহাকে সে ইতিপূর্বেও দেখিয়াছে, এই ঘাটের পথে আলাপও হইয়াছে দুই একদিন। একদিন অযাচিতভাবে তাহার রূপ প্রশংসা করিয়াছে। বহুদেশ নাকি ঘুরিয়াছে কাজেম আলি, অনেক মেয়ে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার মতো এমন রূপবতী শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়ে নাই। সে যে-ঘরে যাইবে সে-ঘর তাহার শ্রীতে ঝলমল করিয়া তো উঠিবেই অধিকন্তু সে-ঘরের লক্ষ্মী হইবে অচলা।

কাজেম আলির এত প্রশংসায় সেদিন লজ্জাজড়িত হইয়া উঠিয়াছিল মরিয়ম। মুখ তুলিয়া তাহার দিকে একবার চাহিতেও পর্যন্ত পারে নাই। কিন্তু সেদিন হইতে কিশোরী মরিয়মের দৃষ্টিতে যেন একটা অপূর্ব অনাস্বাদিত জগতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল।

বাড়ি ফিরিয়া কাজেম আলির কথাগুলি ভাবিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছিল মরিয়ম।

কাজেম আলি দেখিতে সুপুরুষ। লম্বা, চওড়া, ফর্শা দীর্ঘ চেহারা। মাথায় কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো চুল। লোকটি তাহাদের একরকম শত্রু হইলেও সেদিন ভালো লাগিয়াছিল মরিয়মের। খালের ও পাড়ের পথ দিয়া সুসজ্জিত বেশে প্রায়ই সে হাটের পথে যাওয়া আসা করে; মরিয়ম আম বাগানের আড়ালে দাঁড়াইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাকে বহুবার ব্যগ্রচোখে পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। প্রচলিত ধারণামতো লোকটিকে মন্দ বলিয়া মন মানে নাই।

সামনা-সামনি আরো দেখা হইয়াছে কিন্তু কখনো তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই মরিয়ম। ভাবিয়াছে অবার দেখা হইলে নিশ্চয়ই সেও কিছু কথা বলিবে, প্রতিদিন বোবার মতো নীরব থাকে, এতে কাজেম আলিই বা ভাবিতেছে কী! কিন্তু কার্যকালে কি এক দুরতিক্রম্য লজ্জা বারবার তাহার সমস্ত বাকশক্তি যেন হরণ করিয়া লইয়াছে!

আজও চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিল না, মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল—না, ভয় কিসের? —অ্যাঁ, ভয় কিসের? হ্যাঁ, তা ঠিক—বলিতে বলিতে কেমন অস্বাভাবিক কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল কাজেম আলি।

মরিয়ম একটু ঘাবড়াইল। এ কথাটায় এত জোরে হাসিবার কি আছে? এক লহমা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল হাসিটাও ঠিক স্বাভাবিক নহে। কাজেম আলি এক পা আগাইয়া আসিল—ভয় কর না তাহলে? তা, মানুষটি আমি খারাপ নইগো তাহলে, কি বলো?

মরিয়ম তাহার বলিবার ভঙ্গিতে একবার হাসিয়া ফেলিয়াই আবার সংযত হইল।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল।

কাজেম আলি হাতের লাঠিখানা দিয়া একটা ঝোপের উপর আস্তে আস্তে আঘাত করিতে করিতে কহিল, তোমার বাবার কাছে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলাম শুনেছো বোধ হয়?

মরিয়মের মাথাটা এবার ঝুঁকিয়া পড়িল।

—কিন্তু সে সোজাসুজি না বলে দিয়েছে। পুরানো শত্রুতাটাকে সে ভুলতে পারেনি। কিন্তু তোমার দিকটাও ভাবা উচিত ছিল তো তার। ঘর তো ভেঙে পড়ল বলে। এর পরে কোথায় থাকবে, কি খেয়ে বাঁচবে? আমার হাতে পড়লে কোনো দুঃখ থাকতো তোমার বা তোমার বাপ-মার? অঢেল আমার টাকা। গয়না কাপড়ে মুড়ে রাখতাম তোমাকে। তোমার বাপ-মা ভাইটারো বা দুঃখ থাকত কী? আমাকে জামাই পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের ছিল তোমার বাবার পক্ষে। বলতে পার, সতীনের ঘর কোন দুঃখে করে মানুষ। কিন্তু জানতো, সে-ঘরে কোনো ছেলেপুলে নেই আমার, বারোমাস তার অসুখ। তার উপর স্বভাবে উগ্রচণ্ডী, রাতদিন কেবল ঝগড়া-ঝগড়া। কোনোদিন মনের মিল হয়নি, হবেও না। তোমাকে পেলে তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিতাম।

কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে বিরাম লইতেছিল কাজেম আলি। এবার একটু থামিয়া করুণ স্বরেই কহিল—বিয়ে আমার একটা করা দরকার, এত বিষয় আশয় করলাম, ভোগ করবে কে? মরে গেলে বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ থাকবে না!

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়মের মুখভাবগুলিও সে লক্ষ করিতেছিল। যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে কিছু। কিন্তু মরিয়মের মুখ যে সেই নত হইয়া পড়িয়াছে, আর উঠিল না।

কাজেম আলি আর একটুকাল উসখুস করিয়া, অপেক্ষা করিয়া কহিল—তোমার বাবাকে পেলে কথাটা আবার ভেবে দেখতে বলতাম। তোমাকে রাজকন্যার মতো সুখে রাখতাম মরিয়ম!

সে চলিয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল মরিয়ম। চেতনা যখন হইল, সে যেন স্বপ্নের মধ্য হইতে জাগিল। পিছনে তাকাইয়া দেখিল কাজেম আলি তখনো দূরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

মরিয়ম তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

কাজেম আলি দূরে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ দেখিল তাহার গমন ভঙ্গিমা, গুরু নিতম্বের ছন্দ। মুখভাব কেমন অদ্ভুত হইয়া আসিল তাহার। একেবারে না হউক, মেয়েটাকে একবারো যদি সে তাহার আলিঙ্গনের মধ্যে পাইত! হরণ করিয়া লইয়া যাইবে নাকি?— গাঙের পথে সরিয়া পড়িতে কষ্ট হইত না।

কিন্তু তার আগে রহমালিকে আর একবার বলিয়া দেখা ভালো।

ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক, উহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

স্নান সারিয়া মরিয়ম আসিয়া দেখে ফজু তাহার মায়ের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে। অনেকদিন তাহার দেখা ছিল না। একে শরীর শীর্ণ, তার উপর আরো একটা কালিম ছায়া পড়িয়াছে।

বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া খুশি হইল মরিয়ম, কখন এলে ফজু ভাই?

—অনেকক্ষণ। কেমন আছ?

—আছি ভালো, কিন্তু তুমি অমন শুকিয়ে গেছো কেন বলো দেখি!

ফজু থতোমতো খাইয়া তাহার এই দরদী প্রশ্নের উত্তরে কী জবাব দিল, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

মরিয়মের মা কহিল, দিন রাত ভুতের মতো খাটছে, শরীরের কি কোনো যত্ন আছে!

ফজু কেমন বিমর্ষভাবে মরিয়মের দিকে চাহিয়া ছিল, মরিয়ম একটু বিব্রত হইতেই, দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল, এবার তাহলে উঠি খালা (মাসী), যাচ্ছিলুম হাটে, ভাবলাম দেখা করে যাই।

মরিয়মের হাসি নিভিয়া গেল—সে কী! বসো, কতদিন তোমাকে দেখিনি, এলে যদি বসো না, গল্প করি একটু।

কলসীটা হাতিনার এক পাশে নামাইয়া, বাহিরে লাউমাচার সঙ্গে ভেজা কাপড়টা ঝুলাইয়া দিল মরিয়ম।

ফজু খানিকক্ষণ তেমনি দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া, গাঙের দিকে দৃষ্ট ফিরাইয়া নিল। দুপুরের রৌদ্রে গাঙের জল রুপার মতো ঝলকাইতেছে। এদিকে ওদিকে ছোট ছোট ডিঙি। পুবালি বাতাসে তরতর করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে পালতোলা বড়ো বড়ো নৌকা। তাকাইয়া তাকাইয়া কেমন বিষন্ন হইয়া পড়ে ফজু। চারিদিকের নিষ্করুণ রৌদ্র পৃথিবীর বিশালতা প্রকট করিয়া তুলিয়াছে; আর তাহার মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত একাকী নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে হইল তাহার। তাহার জীবনে কেবলই যেন রৌদ্রের পীড়ন, এই রকম একটু প্রশান্ত আবহাওয়া সেখানে নাই। এই ঘর, ঐ উঠান, লাউমাচা, কাপড় মেলিয়া দিবার মতো এই রকম একটু শোভন গৃহস্থালি। ক্লান্ত হাতে ঐ গাঙ বাহিয়া আবার বাড়ি ফিরিবে, অশেষ কষ্ট করিয়া রান্না করিবে, খাইবে—যত্ন করিবার

কেহ নাই, দেহ শীর্ণ হইয়াছে বলিয়া আফশোষ করিবারও কেহ নাই।

বহুদিন সে আর এদিকে আসে নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে মরিয়ম কি কোনো অভাব বোধ করিয়াছে তাহার? হয়তো সে শুকাইয়াছে, চিন্তায় চিন্তায় মলিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা কাহার জন্য, তাহা কী জানে না মরিয়ম? ঐ রকম একটু ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন, একটু সহানুভূতির দৃষ্টিই তো চায় ফজু,—যে দৃষ্টি তাহার দৈনন্দিন রূঢ় জীবন-সংগ্রামের পথে পথে রাখিবে একটু প্রসন্ন প্রশান্তি।

নানাকথা হয় মরিয়মের সঙ্গে। ফজু কখনো তাহার হাসিতে যোগ দিল, কখনো সে বিমর্ষ চোখে গাঙের পালতোলা নৌকাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। অন্যমনস্ক সে, অন্যমনস্ক তাহার মন। অন্তরের কী একটা দ্বন্দ্বকে সে যেন মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াই নিঃশেষ করিয়া দিতে চায়।

—তোমার কী হয়েছে বলো দেখি?

ফজু চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি বলে—কই, কিছু হয়নি তো?

—কি ভাবছিলে তাহলে?

ফজু চুপ করিয়া রহিল। কি ভাবিতেছিল তাহা শুনিয়া লাভ কি মরিয়মের?

আর, আশৈশব যাহার সঙ্গে এত প্রণয়, তাহার সম্মুখে সে স্বীকৃতিই বা দেয় কি করিয়া? মরিয়মের কি বোঝা উচিত নয় কিছু?

বলিবে কি ভাবিতেছিল? বলিবে নাকি, যে ভাবিতেছিলাম তোমারই কথা। তোমাকে আমার চাইই মরিয়ম। আমি অতি

দরিদ্র জানি, আমার ঘরে তোমাকে নেবার মতো অবস্থা নাই জানি, জানি আমার জীবিকারও কোনো সংস্থান নাই, কিন্তু তুমি যদি আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াও তবে এই নিষ্ঠুর উদাসীন পৃথিবীকে আমি ভয় করিব না। ভয় করিব না দুঃখের শত সহস্র ছোবলকেও—তোমাকে পাশে লইয়া, তোমার হাতে হাত বাঁধিয়া লইয়া আমি সকল দুঃখকে জয় করিয়া লইব। তুমি আমাকে ভরসা দিও, আশা দিও—

—বাঃ, কথা বলছ না যে?

—কী ,কী বলব?

—আসনি কেন এতোদিন?

মরিয়মের সব প্রশ্নেরই তো ঐ একই উত্তর। মিলন যেখানে হইবে না, সেখানে কী লাভ ভালোবাসার কথা জানাইয়া?

—বেশ মানুষ তো, ভাবছো কী?—তাহার হাঁটুতে একটি ঠেলা দেয় মরিয়ম।

ফজু অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—কেন আসিনি, তার কিছু জানো না?

—কই, নাতো!—

ফজুর কণ্ঠস্বর লক্ষ করিয়া মরিয়মের হাসি বন্ধ হইয়া গেল।

—যে আশা করেছিলাম, তাই যখন ভাঙলো—

ফজু কথা শেষ করিতে পারিল না; থামিয়া শেষে উঠিয়া পড়িল—অমি উঠি এবার, কাজ আছে অনেক—

মরিয়মের মুখ অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবার দুইটি জিজ্ঞাসু আর্ত চক্ষু তাহার দিকে নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল; যেন উপলব্ধি হয় নাই ফজুর কথা মুখ দিয়া অস্ফুট প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল—কী আশা?

ফজু মুখ ঘুরাইয়া কহিল, 'তা তোমার জানা উচিত মরিয়ম, অন্তত আমার এই আশ্বাসটুকু ছিল যে তুমি জানতে।—তুনিয়ার আর কেউ না জানুক, অন্তত তুমি আমি জানি—

ফজুর কথায় আটকাইয়া গেল ; তারপর অকস্মাৎ তাহাকে গাঙের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে দেখিল মরিয়ম। নৌকায় উঠিয়া ভাসিয়া পড়িয়াছে ফজু, পিছন ফিরিয়া তাকাইল কয়েকবার। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়াও গেল। মরিয়মের মনে ফজুর স্বপ্নকথাগুলি গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কী আশা ছিল ফজুর, ভাবিতে ভাবিতে সে রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। আশৈশব খেলার সাথী, যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এত বড় হইয়া উঠিল, যাহার ছেলেমানুষী চিত্তের জন্য মনে মনে তাহার স্নেহ ও করুণার অন্ত নাই।—সে কী তাহাকে বধূরূপে নিজের গৃহে নিবার আশা করিয়াছিল? ঐ শীর্ণ আত্মীয়হীন তুঃখী মানুষটি হইত তাহার স্বামী? ফজু কি তাহার কথায় ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছে!

রহমালি সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া আসিল বিকেলের দিকে। মরিয়মের মা জানাইল, ও বেলা ফজু এসেছিল।- বললে, গাঙের যা অবস্থা, যখন তখন ভেঙে পড়তে পারে। তোমরা এখুনি অন্য কোথাও উঠে যাও খালা, নয়তো আমি একলা ঘরে থাকি, অন্য কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ও খানেই এস না। আর সত্যিই তো, অবস্থা যেরকম, ঐ দেখ না চেয়ে ; আমি তো ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি—

রহমালি চিন্তান্বিত মুখে গাঙের দিকে চাহিয়া শুধু কহিল—হুঁ।

—হুঁ কী গো! যা করবার এই বেলা কর। গত রাতে তো তুচোখের পাতা এক করার ভরসা পাইনি!

—যাবো কোথায় বল! ফজুর ওখানে গেলে যে নানাকথা উঠতে পারে সেকথা ভেবেছ? তাছাড়া, কোন মুখেই বা তার ঘরে গিয়ে উঠি!

মরিয়মের মা কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল—কি বলছো? রহমালি তেমনি চিন্তান্বিত মুখেই কহিল, গ্রামে আর কারো ঘরে গিয়ে ওঠার উপায় রাখেনি আর কাজেম আলি। ফজুকেও আমি নিরাশ করেছি, আজ এত বিপদের সময় সে যদি সাহায্য করে প্রতিদানে কি আমাদের কিছু করা উচিত নয়? কিন্তু মেয়েটাকে জলে ভাসাব না ওর হাতে দিয়ে।

রহমালির কথাগুলি ঠিক পরিষ্কার না হইলেও মরিয়মের মা ফজুর ওখানে যাইবার সংকোচটুকু অনুমান করিতে পারিল। কহিল, ছেলেটা খুব ভালো, সেজন্য সে কোনো রাগ করে থাকেনি। আমরা ওখানে গেলে সে নাকি আরো খুশিই হবে।

—আরো খুশি হোতো মরিয়মকে দিলে!

মরিয়মের মা চুপ করিয়া রহিল। রহমালিও তাকাইয়া রহিল গাঙের দিকে। বেলাশেষের সূর্যরশ্মি ম্লান ঝিকমিকানি তুলিয়াছে তাহার বুকে। হাওয়া পড়িয়া আসিয়াছে, পালতোলা নৌকাগুলি আর আগের মতো গ্রীবা ফুলাইয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিতেছে না।

চতুর্দিকে একটা গম্ভীর থমথমে ভাব ছাইয়া আসিতেছিল। কি রকম একটা গুমোট অস্বাচ্ছন্দ্য। দুইজনেরই মন তাহাতে পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল।

রহমালি মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাজেম আলি শত্রুতার আর শেষ রাখল না। মরিয়মের সম্বন্ধ করা মুশকিল হবে।

—কেন?

—কী সব কুৎসা রটাবে নাকি ওর নামে। তাহলে কি সেধে মেয়েকে আর ঘরে নিতে চাইবে কেউ।

—ওমা, সে কী গো, এমন কি কেচ্ছার কাজ করেছে সে?

—করেনি সে কিছুই, তাতো তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু হাত কাদায় পড়লে চামচিকেতেও লাথি মারে। চামচিকে ঐ কাজেম আলিইটাই তো আজ গাঁয়ের মোড়ল, সে কিছু একটা বানিয়েও প্রচার করলে, গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস করতে বাধবে না। ভেবেছিলাম কোথাও ওর সম্বন্ধ ঠিক করে সেইখানে না হয় উঠব এই বিপদের সময়ে কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—কিন্তু গ্রামে এমন কেউ নেই এখন যে কাজেম আলির টাকার অনুগ্রহ নেয়নি। তাই তার বিরাগভাজন হয়ে সম্বন্ধও কেউ করতে চাইল না।

—সে কী! তাহলে উপায়?

—উপায় এখন খোদার হাতে!

রহমালি খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কহিল, এক সহজ উপায় আছে ফজুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। কিন্তু—

বৈকালের ম্লান ছায়া ক্রমশ চতুর্দিক ছাইয়া আসিতেছিল। সারাটাদিন রহমালির নাওয়া খাওয়া হয় নাই। সমস্ত গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এখন ক্ষুধায় পেটের মধ্যে পাক দিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ উঠিয়া কহিল, যাক, ভেবে দেখি আজকের রাতটা।

কিন্তু ভাবা আর হইল না।

সেই রাত্রেই অকস্মাৎ—

সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার পরেই নামিয়াছিল বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজে টিনের চালের উপর একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে ঘুমাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও সকলে, এমন কী মরিয়মের যে অতি-সতর্কা মা সে-ও, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ফজুর কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে মরিয়ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অনেক রাত্রে। তাহার সম্মুখে তুইদিকে খোলা তুই জগৎ সারা মর্মকে আকর্ষণ বিকর্ষণে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে কাজেম আলি, অন্য দিকে ফজু, অন্তরের আসনে কাহাকে ত্যাগ করিয়া কাহাকে সে প্রতিষ্ঠা করিবে!

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল একদিকে অনেক ঔজ্জ্বল্য, অনেক দ্যুতি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কাজেম আলি। তাহার চক্ষু মায়াময়। আবেদন অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে দাঁড়াইয়া ফজু। দীন হীন তাহার ভঙ্গি। দৃষ্টিতে করুণ মিনতি আর অনেক দুঃখছায়া। একখানি হাত ভীরু ভাবে সম্মুখে প্রসারিত। মরিয়ম সে হাতখানা একবার ছুঁইয়া দিলেও যেন তাহার সব দুঃখের অবসান ঘটিবে—

মরিয়ম মনস্থির করিতেছে, দ্বিধায় দুলিতেছে···

অবশেষে সে অগ্রসর হইল······

অন্তরতম আহ্বানকেই সে গ্রহণ করিল······

কিন্তু কী ঠাণ্ডা ফজুর হাত! মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা!

অকস্মাৎ সজাগ হইয়া উঠিল মরিয়ম। হয়ত তখন মাঝরাত্রি। বৃষ্টি থামিয়া গেছে, আকাশে ধবধবে জোৎস্নাও ফুটিয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখে জলের উপর প্রায় ভাসিতেছে সে,

মা-বাবা সবাই মাচায় শোয়া। নিচে শুইয়াছিল সে একা। জল অনুভব করিয়াই তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া দেখিল, দুয়ারের পথ দিয়া প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিতেছে। অবস্থা উপলব্ধি হইতেই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে চীৎকার করিয়া মা বাবার দিকে ছুটিয়া গেল। তাহাদের ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া, দিশাহারা হইয়া খোলা দুয়ারের পথে বাহিরের উঠানে লাফাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পায়ের কাছ হইতে বিশ পঁচিশ হাত লইয়া বিরাট এক চাপ জমি কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। চড় চড় ঝপাস-স করিয়া একটা গুরু শব্দ উঠিল শুধু।

ব্যাপারটা ঘটিল মুহূর্তের মধ্যে; পরক্ষণেই মরিয়ম দেখিল তাহার সম্মুখে ঘরবাড়ির আর কোনো চিহ্ন নাই। পাড় যেখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত নদীর জল সেখানে ছুটিয়া আসিয়া যেন ধ্বংসের করতালি জুড়িয়া দিয়াছে। ভাঙনের পাড় হইতে একটা সুপুরিগাছ কাৎ হইয়া পড়িয়াছে নদীর উপর। আর চতুর্দিক হইতে নদীর লক্ষবাহু ছুটিয়া আসিয়া তাহার শির আপন বক্ষে মিশাইবার জন্য উদ্দাম হইয়া উঠিল। মরিয়ম আর্তনাদ করিয়া আরো পিছাইয়া গেল। যে-স্থানটিতে দাঁড়াইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহাও নদীর গর্ভে ভাঙিয়া পড়িল। খালের পাড়ে একটা খেঁজুর গাছের গুঁড়ির গোড়ায় সামান্য একটু জমিতে সে দাঁড়াইয়া আকুল-কণ্ঠে একবার ডাকিয়া উঠিল—মা, বাজান!

কিন্তু কোনো সাড়া মিলিল না।

ডাকিতে ডাকিতে শেষে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভয় ও দুঃখে শেষে আর স্বরও বাহির হইল না।

তাহার ব্যাকুল আর্তনাদ শুনিতে পাইয়া খালের অপর পাড়

হইতে লণ্ঠন হাতে লোকজন ছুটিয়া আসিল; কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্যে ডাক, তাহাদের কোনো প্রত্যুত্তর আর মিলিল না। অল্পকালের মধ্যেই নদী আবার নির্বিকার হইয়া বহিয়া চলিল। খানিক আগে যে ধ্বংস ঘটিয়া গেল তাহার জন্য তাহার কোনো মমতা নাই। তাহাদের সে নিজের অতলে লুকাইল, কাহারা পাড়ে কাঁদিল সেদিকে সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ছল ছলাৎ শব্দে পাড়ে পাড়ে আঘাত হানিয়া সে পূর্বের মত প্রবহমানা।

ভোর হইল। ভোর গড়াইয়া দ্বিপ্রহরের সূচনা দেখা গেল। বহুজন আসিল সমবেদনা জানাইতে, আসিল কাজেম আলিও। এদিক ওদিক জাল ফেলিয়া ডুবিয়া নানাভাবে খোঁজ করা হইল কিন্তু মরিয়মের মা-বাবা বা ভাইয়ের কোনো সন্ধান মিলিল না। সবাই কহিল, পাড়ে মাটির সহিত তাহারা চাপা পড়িয়াছে নিশ্চয়।

কাজেম আলি কহিল, কেঁদে লাভ কী আর। বসে থেকেই বা ফয়দা কী, চলো আমাদের বাড়িতে।

কিন্তু মরিয়ম অনড়। বাপ মা ভাইকে তাহার পাইতে হইবে। এই দুর্ঘটনা যেন বিশ্বাসই হইতে ছিল না তাহার। তাহাদের সন্ধান না মিলিলে সে কিছুতেই এখান হইতে উঠিবে না।

সকাল হইতে কাজেম আলি তাহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছে, সমবেদনা সহানুভূতি জানাইতেছে আরো অনেক গ্রামিন জন। কিন্তু তবু কান্নার বিরাম নাই তাহার, অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইতেছে।

শেষে বিকাল যখন প্রায় গড়াইয়া আসিল, লোকজন কমিয়া

গেল, কাজেম আলি তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে অনুরোধ করিল, চল, আমাদের বাড়িতে গিয়ে শান্ত হবে, লক্ষ্মিটি—নৌকা নিয়ে ওদিকে লোক পাঠিয়েছি যদি স্রোতের টানে কোথাও ভেসে গিয়ে থাকে, তাহলে তো খবরই পাবে, বসে থেকেতো কোনো লাভ নেই—চল মরিয়ম।

মরিয়ম তাহার সহানুভূতিময় মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা করিতে ছিল না এস্থান ত্যাগ করিতে কিন্তু কাজেম আলির চক্ষু যেন অনেক আশ্বাসমাখা বলিয়া বোধ হইল। ধীরে ধীরে পাশে দাঁড়াইল। তারপর অত লোকজনের মধ্যেও সহসা তাহার বুকের উপর পড়িয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল মরিয়ম।

কাজেম আলি চারিদিকে চাহিয়া একটু লজ্জিত হইয়াই তাহাকে ধরিয়া আপন বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

ডুবাইতে ডুবাইতে ক্লান্ত হইয়া পাড়ে উঠিতেই দূর হইতে এই দৃশ্যটা দেখিল ফজু। দুর্ঘটনার খবর পাইয়া সেই যে ছুটিয়া আসিয়া নিমজ্জিতদের সন্ধানে নামিয়াছে, ব্যর্থ হইয়া উঠিল এইমাত্র।

মরিয়মের কাছে যাইয়া একবার দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু বলিবার ভাষা মুখে যোগায় নাই। তাহা ছাড়া, স্বয়ং তালুকদার কাজেম আলিকে মরিয়মের কাছে দেখিয়া কিছু বলিবার সাহসও সে পায় নাই। এবারও পাইল না।

কেবল শ্রান্ত, শীতকম্পিত বিমর্ষ চক্ষু দুইটি মেলিয়া তাহাদের গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

# ভাঙন

ঈষৎ নীলাভ আলোয় ঝলমল প্রাসাদের অনুরাগে বিধুর নায়িকার চটুল মন-ভাঙাভাঙির কথা বলছিনে, বা কোনো পানসে দুঃখের কাহিনী। এ ভাঙনের ক্ষত আরো গভীর, অনেক সুদূরপ্রসারী।

যে ভাঙনে এর জন্ম সে কাহিনী তো বরাবর শুনেছ, তার চরম রূপ দেখেছ মন্বন্তরে, মাটির অতি নিকটতর সেই সব সংসার কেমন করে ছিন্নভিন্ন, চুরমার হয়ে গেল!—কিন্তু ভাঙনের ইতিহাস এ বিপর্যয়-বিব্রত মধ্যবিত্ত মানুষ যদি তলিয়ে দেখত, তবে তার আত্মব্যস্ত কর্মকোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে এইখানে এসে।

· ছোট গঞ্জ। এক কালে বড় বন্দর ছিল। আজ পাশের পুবে-পশ্চিমে দীঘল নদীর দুরন্ত থাবলে থাবলে—ভেঙে ভেঙে খর্বায়তনা, অধিকাংশই নদীর গর্ভে লুপ্ত।

তবু ওপাশে আছে থানা। সব রেজেস্টারী অফিস। স্কুল। নানা মহাজনের আড়ত। নারকেল সুপুরি আমের আড়ালে আড়ালে পুরানো দালান-কোঠা। লম্বা লম্বা টিনের গুদাম। অল্প কয়েকটা সরু কৃপণ পথ। দুপাশে গাছপালার চাপ। নিষ্প্রভ গাঁদা ফুলের উঁকিঝুঁকি! খাল, নালা, নৌকা। তবু কোনো কোলাহল নেই। হুল্লোড় নেই। অদ্ভুত জায়গা। না-গ্রাম, না-শহর। মৃত, ভাঙা, ছাড়াছাড়া। কৃপণ পথ। দিনেও আবছা কোথাও কোথাও। কোথাও আধ-জঙলা; বাইরের ভাঙনের অন্ধকার যেন অজ্ঞাতসারেই তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তারই সুযোগে কোথাও মন্দির ফুঁড়ে,

কোথাও পাঁচিল ভেঙে ইতস্তত জেগে উঠেছে গাছপালার কাণ্ড। নিবিড় গ্রাম্য স্নিগ্ধতা ছড়িয়েছে তার শাখা-প্রশাখা ; কিন্তু চারিদিকে জরাজীর্ণ দালান-কোঠা, অদ্ভুত নীরবতা আর বিজনতা দেখে অতীতের ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না জায়গাটাকে। অথচ এখানে মানুষ আছে। আছে জীবন।

একটি আঁকাবাঁকা পথ দুপাশে এমনি অনেক সাক্ষ্য রেখে সরু পায় চলে চলে স্টীমার ঘাটে এসে থেমে গেছে। তার বাঁয়ে টিকিট ঘর, দুচারটে চা, পান-বিড়ির দোকান আর নদীর খোলা চর। ডানদিকে অয়েল মিল, ভাঙাপাড়ে অনেক টিনের গুদাম পুবে অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে গেছে। নদীর চরে আর ঘাটে সকালে-বিকালে বেড়াতে আসে গঞ্জের বাসিন্দারা। পথ যেখানে শেষ হয়েছে, তার দুপাশের দোকান থেকে চা খায় আর ভোরের স্টীমার থেকে খবরের কাগজ নিয়ে বাড়ি ফেরে।

পথের পরেই বাঁশে-বাঁধা জেটির পুল ; তারপর ভাসমান পণ্টুন। পুলের গায়ে গায়ে নদীর পাড় ধরে বাঁধা থাকে অনেক 'এক বৈঠার' কেরায়া নৌকা।

খুলনা বা বরিশালের পথে সকালে-বিকেলে চারবার স্টীমার থামে এই ঘাটে। ভোঁ শুনে ঘাটে এসে লোক জমে। মাঝিরা ছইয়ে থেলো হুকো হাতে দাঁড়ায়। টিকিটবাবু আসেন, শান্তিরক্ষাকারী পুলিস এসে জেটির পথ আটকায়। ভীড় জমতে দেয় না খোলা পণ্টুনে।

নদীর জলে আলোড়ন তুলে স্টীমার ভেড়ে। স্বল্প যাত্রীরা ওঠানামা করে। মাঝিরা ডাকে—আয়েন বাবু ইদিকে, কোথায় যাইবেন ?— চা-এর দোকানে কাজ বাড়ে।

অনেক সময় তারিণী একা সামলে উঠতে পারে না। তার মাইনের ছোকরাটি বিড়ি-বটা ফেলে তার সাহায্যে আসে।

উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সালের শীতকালে ভোরের এক্সপ্রেসে সেই ঘাটে একটি লোক নামল। তার গায়ে মিলিটারী লেবার কোরের পোশাক। ফর্সা, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান চেহারা। জেটিতে দাঁড়িয়ে সে তার দৃষ্টি পাঠিয়ে দিল গঞ্জের দিকে, বা তারও চেয়ে আরো কোনো সুদূর মর্মে। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বহুদিন পরে হারানোকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

তখনো সূর্য ওঠেনি। শিশির-স্নাত গঞ্জের চতুর্দিকে বিষণ্ণ পরিচ্ছন্নতা। লোকটি ধীরপদে পুল পার হয়ে পথে এসে নামল।

মাটির স্পর্শে মনে হোলো, সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তারপর নিবিড় পদপাতে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল তারিণীর দোকানের সম্মুখে।

ইতস্তত চারিদিক দেখে লোকটি যেন আশ্বস্ত হোলো, কী রকম একটা আনন্দ দেখা গেল তার মুখে, তারপর ডাকলে—তারিণী খুড়া ?

তারিণীর দোকানে ভীড়। বহুজনের এ-রকম সম্বোধনে সে অভ্যস্ত তাই খদ্দেরকে চা দিতে দিতে মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে—কী ?

ফিরে এসে তাকে একটু পর্যবেক্ষণ করে আবার সুধায়—কী চাই আপনার ?

—ভালো আছেন খুড়া ? কী চিনতে পারেন না ?

—আপনি ?

সম্বন্ধটা তুই-তুকারির আছেলে, 'আপনি' অইলাম কবে খুড়া ?

তারিণী একটু ভালো করে দেখে তাকে। বুড়ো হয়েছে, পাক

ধরেছে চুলে, চোখেও হয়তো একটু কম দেখে আজ-কাল। অস্ফুট স্বরে বলে—আনোয়ার?

—হ্যাঁ, লোকটি হাসে।—লম্বা অইয়া গেছি খুব, না?

একটা কালো ছায়া মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায় তারিণীর চোখ-মুখ থেকে—আরে! তুই! কবে আইলি! চেনতে না পারারি কথা বাবা। সেই যে পলাইয়া গেলা, আর এতোদিন বাদে চেহারাটি এক্কেবারে বদলাইয়া ফিরইয়া আইছো। আয়, বস্। চা খাবি?

গদির চৌকির একপাশে তাকে বসায় তারিণী।

—তা বদলাইবেই বা না ক্যান? রাজার খাবার, রাজার পোশাক তো! 'আপনি' কী আর সাধে মুখ দিয়া বাইর অয়!

—তারপর—ছুটিতে আইছো না ছাড়ইয়া দিলো?

—ছাড়ইয়া দিলো। আপনারা তো হেই রহমি আছেন। কিছু বদলায় নায়—

কথার ফাঁকে ফাঁকে ব্যস্তভাবে খদ্দেরদের তদারক করে তারিণী—আপনার এক কাপ চা-তো খালি? এই নেন।—

—হ্যাঁ—কতো বদল অইলে বাবা! কতোদিন বাদে আইলা যেনো?

—আড়াই বছর!

—কোথায় কোথায় ছিলা এতোদিন?

—অনেকখানে। দেরাদুন, আফ্রিকা, ইটালী—সেখান থেকেই এই ফিরলাম।

একজন খদ্দের তার দিকে মনোযোগ দেয়—ইটালী থেকে?

—হ্যাঁ।—

লোকটির চোখদুটো চকচক করে ওঠে।—দেখলেন সব ঘুরইয়া ফিরইয়া—রোম, ভেটিকান, পম্পেই ?

—হ্যাঁ, জানেন খুড়া, জার্মানির হাতে আটকাও আছেলাম মাস আষ্টেক।

—বলেন কী, বন্দীও অইছেলেন ?

তারিণীও বিস্মিত হয়—হিটলারকে দেখ্‌লা, হিটলার ?

—হ্যাঁ—বলে আনোয়ার চায়ের কাপটা রেখে বন্দী জীবনের একটা গল্প শুরু করে—

রুক্ষ মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে ট্যাংক আর ট্রাকের পর ট্রাক চলেছে ত্রিপলির দিকে। আকাশে খররৌদ্র, বাতাসে আগুনের উষ্ণতা। হঠাৎ সম্মুখে শত্রুর গোলাবর্ষণ। সেই ইটালী-উৎসুক বাবুটি গল্পে জমে যান। এক কথায় আরেক কথা আসে। তারিণীর দোকানে ভীড় আরো একটু বাড়ে।

সূর্য ওঠে। বেলা বাড়ে। খবরের কাগজ হাতে যাবার সময় সেই বাবু বলে যান—সার্থক আপনাগো জীবন !

আনোয়ার খুশি হয়। লোকটিকে সে চেনে। গঞ্জের এক আড়তের কেরানী। তার সাধুবাদে তার মুখ আনন্দে ঝলমল করে।

তারিণী তখনো ব্যস্ত। আনোয়ার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে—আমাগো বাড়ির কোনো খবর জানেন খুড়া ?

—বাড়ির খবর ? ক্যা জানো না কিছু ?—কেটলি হাতে তারিণী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

তার বিস্ময় দেখে আনোয়ার একটু অস্বস্তি বোধ করে—না। ক্যান, কী অইছে ?

তারিণী চোখ ফিরিয়ে একটু এদিক-ওদিক ব্যস্ততার ভাণ করে, হেসে বলে—না অইবে কী ! খবর-টবর পাও কী না হেইয়া জিগাইলাম—

বলতে বলতে খদ্দেরের দিকে খুব মনোযোগী হয়ে পড়ে—আপনার কী চাই আর? আপনার?

একটু আস্বচ্ছন্দ্য বোধ করে আনোয়ার। তারিণীর দৃষ্টিতে যেন কী অর্থ ছিল। মনে শঙ্কা জমে তার।

—যাও বাড়ি যাও—গেলে তো সব নিজের চোখেই দেখবা।

—ভালো আছে তো সব?

—আমি অনেকদিন বাড়ি ছাড়া বাবা।—ও মুকুন্দ, মুকুন্দ—একজন রাস্তার লোককে ডেকে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারিণী। আনোয়ারকে ফুরসুৎ দেয় না আর কিছু জিজ্ঞাসার।

আনোয়ারও শেষে উঠে পড়ে। বেলা বাড়ছে।

—আচ্ছা অন্য সময় আমু খুড়া। এহোন বাড়ির দিকেই যাই।—নেন চায়ের দামটা।

কিন্তু তারিণী কিছুতেই মূল্য রাখল না।—তুই আমারে ঠাওরাইলি কী আনোয়ার?

—আচ্ছা, তাহলে যাই খুড়া। হেসে পথে নামে আনোয়ার; কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে আসে।

তারিণী নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে দোকানেরই কোনো খদ্দেরকে কি বলবার উদ্যোগ করছিল, তাকে ফিরতে দেখেই চট করে মুখের ভাব পরিবর্তন করে—কী ফিরলা যে?

—জাহাজে একজনাড্ডে হোনলাম কাপুড়-চুপুড় পাওয়া যায় না বোলে দ্যাশে—এহানে পামু তো? তারিণী হেসে উঠল—আশা কম। তবে দেহো চেষ্টা কর্‌ইয়া। দেশের অনেক পরিবর্তন অইছে বাবা, যা দেইখ্যা গেছো, হেদিন আর নাই!—

কাপড়ের দোকানগুলো আগের মতোই খোলা। কিন্তু প্রতিটি

তাক তার খালি। ঘুরে ঘুরে অবাক হয় আনোয়ার। সবাই বলে কাপড় নেই। তবে তাদের দোকান খুলে থাকার অর্থ কী! মুখে বলছে বটে বছর খানেক ধরে ব্যবসাই বন্ধ, কিন্তু সত্যিই কী তাই? মহিম পোদ্দারের চেহারায় আগের চাইতেও চর্বির বোঝা। হরিহর সাহার হাতে অতো বড়ো দুটো আংটি এলো কোথা থেকে?

একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই পিছন থেকে একটি লোক ডাকে—ও সাইব, হোনেন!

আনোয়ার দাঁড়ায়।

লোকটি কাছাকাছি এসে ফিস ফিস করে বলে—আমার সন্ধানে আছে কাপড়। নিতে গেলে দামটা এট্টু বেশিই পড়বে। আড়ালে কারবার, বুঝলেন কিনা!—হাসতে চায় লোকটি।

আনোয়ার হতাশ হয়ে পড়েছিল। হোক একটু বেশি দাম। উৎফুল্ল হয়ে সে মা-বোন আর পিতার জন্য কেনে এক এক জোড়া। কেনে আলতা, চিরুণী, পাউডার। বোনদের জন্য নানা উপহারের জিনিস।

সেগুলো সংগ্রহ করে যখন বাড়ির পথে পা বাড়ায় ইতিমধ্যে অনেকখানি উঠে এসেছে সূর্য। কিন্তু বনে-জঙ্গলে রুদ্ধশ্বাস গঞ্জের তখনো শীত কাটেনি। আঁকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে পুরাতনকে নূতন করে দেখতে দেখতে প্রফুল্লমনে বাড়ির পথে চলে আনোয়ার। নিস্তব্ধ পথে দুপাশের বাসিন্দাদের চমকে হাড় বার করা রাস্তায় তার বুট শব্দ করে খট, খট, খট…

আড়াই বছর আগে এই পথেই একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল আনোয়ার।

মনে মনে অতীতের কথা স্মরণ করে লজ্জা অনুভব হয় তার। কী দুরন্তই না ছিল! সবাই তাকে জানত উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে বলে। গ্রামময় দাপাদাপি মারামারি করে বেড়াত। গরিব, অতিগরিব অজস্র কষ্ট দিয়েছে এজন্য। হয়তো তাদের জীবন তাকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সংসারের কোনো কাজেই লাগতো না বলে নিত্য গালমন্দ, প্রহার জুটত তার ভাগ্যে। মার খেয়ে এদিক-ওদিকে গুম হয়ে পড়ে থাকলে ঘরে মা বা বোনেরা ডেকে নিয়ে যেত। বিশেষ করে সর্বকনিষ্ঠা বোনটির তার প্রতি সহানুভূতির অন্ত ছিল না।

কিন্তু যোলো বছর বয়সের সময় মুহূর্তের ভুলে আত্মসংযম হারিয়ে সে যে কাণ্ডটি করে বসল, তা জানতে পেরে হয়তো লজ্জায় মাথা কাটাই গিয়েছিল তার পিতা অজিউল্লার।

এসকেন্দার আলির বারো বছরের মেয়ে ময়নাকে দেখে অবধি ভালোবেসে ফেলেছিল আনোয়ার। সুন্দরী মেয়ে ময়না। ডাগর-ডোগর গড়ন। বিয়ে হয়নি তখনো। অনেক বার তারও অপাঙ্গে চাহনিতে আনোয়ারও টের পেয়েছিল তার স্বীকারোক্তি, নইলে সেইদিন নিরালা সন্ধ্যায় কোন সাহসে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল? তার সুন্দর লালিম ঠোঁটে ব্রীড়াবিধুর হাসি দেখে সব সংযমের বাঁধ টুটে গেল তার। প্রথম যৌবনের উন্মেষিত ভীরু অথচ উগ্র কামনায় ফুলের মতো কোমল ময়নাকে সে যেন নিজের সর্বাঙ্গে মিশিয়ে নিতে চেয়েছিল। ময়না থর থর করে কেঁপে উঠল তার আলিঙ্গনের মধ্যে—একটু বাধা দেবার চেষ্টা করে তারপর একেবারে নির্জীব! তারপর যখন দেখল সন্ধানে-আসা ছোটো ভাইয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি

ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে চিৎকার করে কেঁদে উঠল ময়না—বিস্মিত, ব্যাকুল, ভীরু প্রণয়ী আনোয়ার ছুটে পালাবার পথ পায়নি সেদিন।

সন্ধ্যায় দুরু দুরু বুকে বাড়ির বাইরে থেকে শুনল পিতার গলা—ব্যাপারডা জানাজানি কইরেন না মাঝি, হারামজাদা আউক বাড়ি, আইজি সমুচিৎ শিক্ষা দিয়া হাড় জুড়ামু।

এরপর ক্রোধোন্মত্ত অজিউল্লার সামনে আর আসেনি আনোয়ার। সেই রাত্রেই বহু দুঃখ আর বহু লজ্জা নিয়ে সে গ্রাম ত্যাগ করল। সেদিন ক্ষোভ জেগেছিল ময়নার বিরুদ্ধে, বাপের বিরুদ্ধে, সমস্ত আথরপাড়া গ্রামের বিরুদ্ধে। সেই ক্ষোভই তাকে প্রেরণা দিলে মিলিটারিতে ভর্তি হতে, স্বদেশের মাটি ত্যাগ করে যেতে। ময়নার কাছে ঐ ব্যবহারের প্রত্যাশা তো তার ছিল না!

দেরাদুন ট্রেণিং-এ থাকার সময় দু'মাসের মাইনে বাড়িতে পাঠিয়েছিল আনোয়ার। তা ফেরৎ এল। উদ্দিষ্টকে পাওয়া যায়নি। আনোয়ার ভাবল হয়তো রাগ করে রাখেনি তার বাবা। কয়েকবার মাপ চাওয়া সত্ত্বেও বাড়ি থেকে পাওয়া যায়নি কোনো প্রত্যুত্তর-পত্র। অনুতাপদগ্ধ আনোয়ার হতাশ হয়ে দিনের পর দিন এই লড়াই-এর জীবন থেকে মুক্তির কামনা করেছে। তারপর ডুবে গেল কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে—কতো রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেল জীবনে...

গঞ্জের ঘুপটি ছাড়িয়ে মুক্তমাঠে কাঁচাপথে এসে পড়ে আনোয়ার। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পায়ের নিচে কাঁচামাটির স্পর্শে। বিস্তৃত মাঠ, ক্ষেত, আকাশ আর সবুজ গ্রামের দিকে তাকিয়ে সে বুক ভরে শ্বাস

গ্রহণ করে। হেঁটে যায় পথের পাশে শিশিরসিক্ত দুর্বাদলের ধারে ধারে। কতো কাম্য ছিল এই প্রত্যাবর্তন!

মনে পড়ে আফ্রিকার সেই রুক্ষ দিনগুলো। চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যেপে উষর মরু-প্রান্তর। নেই ছায়া, নেই মেদুরতা। সেই আগ্নেয় উষ্ণতার মধ্যে এই স্নিগ্ধ শ্যাম দেশের কথা কল্পনা করে মন হাহাকার করে উঠত। সেখানকার আকাশে ছিল না এমনি শুভ্র বলাকার অভিযান, মাটিতে ছিল না সোনালি শস্যের সমারোহ। উড়োজাহাজের ঘর্ঘর, ট্যাংক, ট্রাক, আর লরী এবং অবিশ্রাম গোলাগুলীর মধ্যে জীবনটুকু হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে করতে মনে হোতো রুক্ষ বালুকণার দেশ শ্যাম দেশের জীবনীটুকু শুষে পান করতে চাইছে।

তবু তারিণী খুড়োর চোখে আগের চাইতে চেহারা নাকি অতি চমৎকার হয়েছে তার! জার্মানদের হাতে বন্দী থাকার সময়কার চেহারা যদি দেখতো তারিণী খুড়ো—তবে ইটালীতে গিয়ে সত্যিই সে খুশি হয়েছিল। অবিরাম কর্মের ছেদ পড়েনি বটে, তবু সে আরাম পেয়েছে অনেক। সেখানে আছে বর্ণালি গাছপালা, প্রকৃতির সজীবতা। এই বাংলা দেশেরই মতো সেখানে শস্যের ক্ষেতে মাতন তুলে হাওয়া বয়। গাছে গাছে ছবির মতো রঙিন আপেল আর ষ্ট্রবেরী। লতায় লতায় থোকায় থোকায় সুপুষ্ট আঙুর। জ্যোৎস্না রাত্রে ছোটো কুলুকুলু ঝরণার পাশে আঙুরকুঞ্জে বসে আকাশভরা ঝলমলে রুপোলি জোৎস্না দেখেছ কোনোদিন? অথবা বিকেলে নিভন্ত আলোয় দাঁড়িয়ে বহু রঙের ঘাসফুলে আর সবুজ তৃণে ঢাকা ছোটো ছোটো পাহাড়? জীবন সার্থক হয় সে দৃশ্য দেখে। আর মনে থাকবে সে দেশের ডালিম রঙের মেয়েদের কথা। তারা এদেশের

ছোটাই বিবি, সোনাভানু বা ময়না বিবি নয়—পরীর মতো সুন্দরী, দুধে আলতায় গোলা গায়ের রঙ। সারাদেহে রক্তাভ 'যৈবন' আঙুরের মতোই টইটম্বুর। তাদের চাষির মেয়েদের প্রজাপতির মতো বেশ, রূপকথার রাজকন্যার মতো ভঙ্গিমা। যদি একজনকে দেখ, বা শোনো কাঁচভাঙার মতো, ঝরণার উদ্দামতার মতো হাসি তাহলে কোনো স্বপ্নের রাজ্যে উধাও হয়ে যাবে তোমার মন। আনোয়ারের সে এক স্মৃতি !

বিশেষ করে মনে থাকবে সেই এমার কথা। তাদের তাঁবুর কাছে পাহাড়ের কোলে যাদের কাঠের ঘর, নিত্য যে বিকেল বেলায় বাড়ির সম্মুখের তৃণভূমি থেকে নধর গাই দুটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

অল্প বয়সী গরীবের ঘরের মেয়ে এমা। তার সঙ্গে পরিচয় হোলো ঘটনাচক্রে। তারপর ঘনিষ্ঠতা। প্রথম প্রথম ভয়-সংকোচ অনুভব করেছে আনোয়ার। সাহেব দেখলেই কেমন যেনো ছোটো হয়ে যায় সে। কিন্তু অতি গরীব ঘরের মেয়ে এমার সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশার ফলে একদিন আর সে সংকোচটুকু রইল না। বন্ধুদের পরামর্শ মতো সে তাকে এনে দিতো নানা উপহার। এমা মুগ্ধ হোতো।

তারা একদিন সন্ধ্যায় ঝরণার দিকে তাকিয়ে একটা গাছের নিচে দুজনে বসেছিল। আকাশে একটু বাঁকা চাঁদ। জ্যোৎস্না টলটল করছে ঝরণার জলে।

ভয়ে ভয়ে আনোয়ার এমার শুভ্র নিটোল একখানা হাত স্পর্শ করল···

এমা একটু হেসে মুখ তুলে আনলো···ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে মোমের পুতুলের মত এমার সৌগন্ধময় নরম দেহটিকে আনোয়ার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যত না করেছিল উপভোগ তার চাইতে

বেশি করেছিলো অনুভব। যাবার সময় নূতন একটা ঘাঘরা তৈরির টাকা চেয়েছিল এমা।

তবু সে সন্ধ্যাটি চিরকাল মনে থাকবে তার। এমার চুলে ছিল কটা গন্ধ। পয়সার অভাবে তেল মাখা হোতো না। আঁটোসাঁটো ভরপুর দেহটি পুরানো ঘামে-ভেজা জামায় মানাত না। সংসারে অগাধ দারিদ্র্য। বাবা রুগ্ন। মা বৃদ্ধা। এক ভাই ছিল, যুদ্ধে মারা গেছে। দুবেলা ভালো করে খেতেও পেতো না তারা। প্রায় একটি বছরই তো আনোয়ার ছিল সেখানে—যথাসাধ্য সাহায্য করে এমাকে সে সম্পূর্ণ জয় করেছিল।

ইচ্ছে করলে সেখানেই থেকে গিয়ে এমাকে বিয়ে করে ঘরকন্না পাততে পারত আনোয়ার। কিন্তু লড়াই বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ফেরার কি রকম টান এসে গিয়েছিল মনে···

জীবনে হয়তো আর এমার সঙ্গে দেখা হবে না। এমা কী তাকে মনে রাখবে? এমনি সকালে গাই দুটি নিয়ে মাঠে নামত সে···আর কি পারবে কোনোদিন পর্বতসানুদেশের এমার সেই বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে?

আসার দিন বিদায় নিয়ে আসাও হয়নি তার কাছে।

—কে যায়েন?

পাশের ক্ষেতে কর্মরত একজন চাষি ডেকে শুধায়। যথাযোগ্য জবাব দিয়ে আবাব অগ্রসর হয় আনোয়ার। একটুও বদলায়নি গ্রাম। আগের মতোই দুপাশে বিশাল বিশাল শস্যভরা মাঠ। কর্মরত চাষির দল। অপরিচিতকেও ডেকে সেই আলাপের

অন্তরঙ্গতা। পাশের নালায় জল সেচে মাছ ধরছে ছোটো ছোটো ন্যাংটা ছেলেমেয়েরা। দূরে দূরে সন্তর্পণে জলের কিনারায় তেমনি ঘাড় ডুবিয়ে বসে আছে বক। তার পদশব্দে ঘাড় তুলে ঐ ছেলেমেয়েদের মতোই তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

হাওয়ায় জড়ানো শিশির। খেজুরকুঁড়ি আর রসের সুবাস। শীতকালের মধুর গন্ধ! আনোয়ার অনুভব করে সত্যিই এবার নিজের দেশে এসেছে।

বাড়ি গিয়েও হয়তো বিশেষ পরিবর্তন দেখবে না। সবই আছে হয়তো আগের মতো। সেই খালপাড়ে কলাগাছে ঘেরা কুঁড়েঘর। পেছনে পুকুরঘাট।

বাবার আছে সেই পুরানো কাশির অসুখ। মায়ের গৃহস্থালি গোছাবার প্রাণান্ত প্রয়াস! আনোয়ারকে পেয়ে আবার খুশি হবে না তারা? আরো খুশি হবে তাদের পায়ে এতোদিনকার সঞ্চয় বাণ্ডিল-বাঁধা টাকা আর এই সব উপহার পেয়ে। মা হয়তো দীর্ঘ দিন পরে তাকে কাছে কোলে নিয়ে কাঁদতে বসতে চাইবে—ধ্যাৎ, মায়ের যা স্বভাব!

বোনেরা সব বিচিত্র উপহার পেয়ে আহ্লাদে অধীর! প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে জর্জরিত করে তুলবে।

মা হয়তো বোনদের বলবে—কী নাচানাচি লাগাইছো হারামজাদিরা, শীগ্‌গির ভাত চড়াইয়া দে, কবে না কবে খাইয়া আইছে মুখখানা শুখাইয়া গেছে! আহা!

তারপর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠবেন—

ওরে নিঠুরইয়া, তোর কী এই রহম দাগা দিয়া পলাইয়া যাওনডা উচিৎ অইছেলো! একবারো ভাবলি না—

সে সব কাণ্ড করে অনেক লজ্জা দেবে মা। বাবা হয়তো টাকার বাণ্ডিল, কাপড়গুলো হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে সস্মিতমুখে তাকিয়ে থাকবেন তার দিকে খুশিতে উজ্জ্বল মেয়েদের দিকে, খুশিতে তারা ঝলমল করবে না মুখ! যে রাগ আড়াই বছর আগে দেখে গেছে, তার আর কোনো চিহ্ন দেখবে না কোনোখানে!

কিন্তু বোনদের যদি বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে। তাহলে বাড়ি পৌছেই নৌকো নিয়ে তাদের আনতে বেরিয়ে পড়বে। তাদের আদরের 'মেয়াভাই' আনতে গেলে লাফিয়ে নৌকোয় উঠবে তারা। ছোটো আদুরে বোন ফুলি ওরফে কামরুন্নেচ্ছা তাকে দেখে আনন্দে কেঁদে না ফেললে হয়।······

বড়োজনের মতো গম্ভীর সংযত নয় সে। তার প্রকৃতিটা অত্যন্ত চঞ্চল। হরদম্ ঝগড়া করত তার সঙ্গে, বাপ মায়ের বকুনি খাওয়াত, আবার পরক্ষণেই এসে ভাব করে যেত।

একদিন চড়ুইভাতি করবে ফুলি—বাড়ির সবারই তাতে দাওয়াৎ। আনোয়ার তামাশা করতে গিয়ে কী একটা জিনিস যেন নষ্ট করে ফেলল। ফুলি গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে নালিশ করলে বাবার কাছে। কী কথায় তার মুখে মুখে জবাব দিতেই অজিউল্লা কান ধরে এক প্রচণ্ড চড় কসিয়ে দিল তার গালে। আনোয়ার কোনো প্রতিবাদ করল না। অভিমানে খেল না চড়ুইভাতি। খেল না রাত্রে। ফুলি অপরাধীর মতো দূরে দূরে রইল। রান্নার অর্ধেক উৎসাহই যেন তার চলে গিয়েছিল। কারো সাধাসাধিতে কান দিল না আনোয়ার, সন্ধ্যের পরই ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখে পাশে উবু হয়ে বসে আছে ফুলি। থতোমতো খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—চোপাড়ডায় খুব ব্যথা পাইছো ম্যাভাই ?

আনোয়ার নিরুত্তরে পাশ ফিরে শুলো।

ফুলি কান্নায় ভেঙে পড়ল—আমারে মাপ করো ম্যাভাই, আর কহনো এ রহম করমু না।

—ঠিক ?

—ঠিক। আল্লার কিরা।—তুমি ওডো ম্যাভাই, খাও আইয়া—একলা উইঠ্যা চুপেসারে রানছি আবার তোমার লইগ্যা—ওডো—

—এই শীতে উইড্যা আবার রানছো ? পাগলী! ভয় করলে না তোর ?

—বুবু আছে না! হে-ও তো চুলাহালে বইয়া রইছে তোমার লইগ্যা, লও শীগ্‌গরি—নইলে একলা আবার ডরাইবে!

তিন ভাইবোনের কাছে সে এক মধুর রাত। আনোয়ার কোথা থেকে অন্ধকারে চুরি করে খেজুর রস আনল, আর আনলা নারিকেল,—তারপর সেইরাত্রে 'সিন্নি' রাঁধা, শীতে গুটিসুটি দিয়ে উনুন ঘিরে চাপা স্বরে গল্প···তারপর কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি করে খাওয়া—এমনকি ঘুম থেকে ভোর রাত্রে মা-বাবাকেও ডেকে তোলা।···

এদের ছেড়ে, এই জীবনকে ছেড়ে কেমন করে দেশ ত্যাগ করতে পেরেছিল ভেবে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এবার আবার সেই মুক্ত মধুর জীবন। খালে খালে মাছ ধরে, ভিটায় ভিটায় ফাঁদ পেতে ঘুঘু, 'কোলায়' ছিটকা পেতে বক শিকার করে, আবারও সেই রকম সব রোমাঞ্চকর রাত্রি উপভোগ করে সেইসব

পুরোনো দিনগুলিকে সে ফিরিয়ে আনবে। তার সমস্ত দুর্নাম সংসারের সমস্ত দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে বাপ-মা-বোনেদের মুখে তৃপ্তি আর আনন্দের হাসি ফোটাবার সাধনা শুরু হবে তার···কতো দারিদ্র্য দেখে গেছে সংসারে। এবার দীর্ঘদিন সঞ্চিত এই অর্থে এক মধুর সংসার রচনা করবে সে, এক মধুর সংসার রচনা করবে সে দারিদ্র্যক্লিষ্ট পিতার সম্মুখে,—তার পাশে সে গিয়ে পরম শক্তি, অভয়বাণীর মতো দাঁড়াবে—আসুক দারিদ্র্যের শত-সহস্র আঘাত, বর্মের মতো সব আঘাত আপন বুকে নিয়ে সকলকে নিঃশঙ্ক করবে··আকাশের চাঁদের অসম্ভব আর অদ্ভুত মনে হবে তখন এমাকে!···

ময়না? ধানক্ষেতের পাশে আমের বাগানভরা বাড়ির মেয়ে ময়না কোথায় আছে এখন? ভিটার নালার ধারে উঁচু পাড়ের উপর দোদুল কাশের পাশে তাকে প্রথম দেখেছিল আনোয়ার···আজো বুঝে উঠতে পারল না তার চরিত্র—সেদিনকার রহস্য···

নানা ভাবনার মধ্যে কখন জেলাবোর্ডের পথে ছেড়ে হাইস্কুলের পাশ দিয়ে বাড়ি যাবার সোজা পথ ধরেছে আনোয়ার।

স্কুলের ছেলেরা তার দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকায়। শুকনো মাটির উপর আনোয়ারের নাল দেওয়া বুট শব্দ করে—খট-খট-খট···

ভারি পুটলিটা সে বদলে নেয় এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে। উৎসাহে আগ্রহে সজীব আনোয়ারের কাঁধে তাকে বহনের এতটুকু দুঃসহতা নেই···বরং আরো হালকা হয়ে পদক্ষেপগুলো দ্রুততর করে আনে···

—হল্ট!

পেছনে কে একটি ছাত্র রসিকতা করে চেঁচিয়ে ওঠে। আনোয়ার অভ্যাসবশে সত্যি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে; তারপর ব্যাপারটা বুঝে একটু

লজ্জা পায়। কিন্তু রাগ করে না, হাসিমুখে পেছনে তাকিয়ে আবার অগ্রসর হয়······

কিন্তু দুপুরের পরেই আবার তাকে নিজের দোকানের সম্মুখে দেখে চমকে ওঠে তারিণী। ধূলিধূসর উন্মাদ উদভ্রান্তের মতো তার চেহারা। দুই চোখে ব্যাকুল শূন্যতা।

তারিণীকে দেখে সে কাঁধের পুটলিটা ছুঁড়ে হাউমাউ করে কেঁদে বলে—ক্যান তুমি আমারে তখন সব কইলা না খুড়া!—এইসব আমি কাগো লইগ্যা নেছেলাম!

তারিণী আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখে তার কাঁধে—কইতে পারি নায় বাবা। আয় বয় আইয়া, এট্টু স্থির হ।—আনোয়ারকে নিয়ে সে বসায়।

আনুপূর্বিক সমস্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে বলে যায় তারিণী। ভাঙা বন্দরের পাড়ে বসে মন্বন্তরে আপন ভাঙন কাহিনী শুনতে শুনতে রোরুদ্যমান আনোয়ারের চোখ-মুখে যে ব্যাকুলতা ফুটে ওটে, তা দেখে ভয় পায় তারিণী। এই বন্দরকে দেখে যেমন মনে হয় কোনো লুব্ধ সওদাগর রুদ্র হস্তে এখানকার জীবনীটুকু লুঠে নিয়ে ভাঙন এনেছে, আনোয়ারের মুখেও সেই রকম নিঃশেষিত ভয়াল ছায়া। তারিণী এক পেয়ালা চা করে তার দিকে বাড়িয়ে দেয়—কান্দিস না। বাপেরে তো আর দেখলি না; কিন্তু ঈশ্বর বাঁচাইয়া রাখলে মা-বুইনগো দেহা পাবি।

মিথ্যা আশ্বাস দেয় তারিণী। দু'বছর যাদের দেখা নেই কে বলবে আনোয়ার আর কোনোদিন তাদের ফিরে পাবে কিনা।

—ওরে পাগল, কাইন্দা লাভ কী আর,—কান্দলেই তো পাবি না—নে চা-টা খাইয়া একটু ঠাণ্ডা হ—তারপর কী করবি ভাব দেহি—

ভাঙা বন্দরের ভুতুড়ে দেহের উপর বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে তখন। গাছের বুকে ভাঙা বেলার রাঙা আলোর ঝলমলানি। পাড় ভাঙে—ঝুপ ঝুপ!

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাঁটুতে মুখ ঢেকে অকস্মাৎ এক সময় মেয়েমানুষের মতো ডুকরে কেঁদে ওঠে আনোয়ার।